বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ | ২য় সংখ্যা | কার্তিক ১৩৯৭

বাংলাদেশে জমি রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন : একটি সমীক্ষা
ছিদ্দিকুর রহমান

বাংলাদেশের দারিদ্র : অতীত ও বর্তমান
সমস্যা ও সমাধান
হীরালাল বালা

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় ইসলামের দৃষ্টিভংগী
আবদুন নূর

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মানবীয় দিক
মোঃ সিরাজুল ইসলাম

থাইল্যাণ্ডের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় কতিপয় দিক
এম, খোরশেদ আলম

পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও বনসম্পদ : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত
কাজী হাসান ইমাম

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

বাংলাদেশে জমি রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন : একটি সমীক্ষা

ছিদ্দিকুর রহমান*

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তি এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত দলিল রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তৎকালে মানুষের নৈতিক মান ছিল অতি উন্নত। জমি-জমাসহ অন্যান্য সম্পত্তির আদান-প্রদানে মানুষের ছিল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর গভীর মূল্যবোধ। বিশ্বাস ভংগের নজিরও ছিল বিরল। কিন্তু বৃটিশ শক্তি অবাঞ্ছিতভাবে এ দেশ দখল করার পর থেকে লাগামহীনভাবে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ এ দেশের শান্ত সমাজকে কলুষিত করে। এহেন পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মধ্যে জমি-জমাসহ অন্যান্য আদান-প্রদানের বিভিন্ন চুক্তি, দলিল-দস্তাবেজের আকারে লিপিবদ্ধ ও রেজিষ্ট্রী করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও আইনগত নিদর্শন সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হয় ১৯০৮ সন থেকে। বহু কালের পুরাতন রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি আজ অনেক ক্ষেত্রে যুগের চাহিদা মিটাতে পাচ্ছে না। তাই এ পদ্ধতির আধুনিকায়ন দরকার।

উদ্দেশ্য ও পরিধি

রেজিষ্ট্রেশন আইন বহু বিবর্তন এবং দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ১৯০৮ সনে এ্যাক্ট XVI-এর মাধ্যমে একটি সুবিন্যস্ত এবং পরিশুদ্ধ রূপ লাভ করে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে বর্তমান রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতিকে কিভাবে আধুনিকায়ন ও জনকল্যাণকর করা যায় তা এই সমীক্ষার বিষয়বস্তু।

প্রাসংগিক আলোচনায় রেজিষ্ট্রেশন আইনের মৌলিক দিক আলোচনাসহ রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন ও গতিশীল করার প্রচেষ্টা চালান হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের বিস্তারিত তথ্য রেজিষ্ট্রী পরিদপ্তর হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন সম্পর্কে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তা, প্রাক্তন আই. জি. আর এবং বর্তমানে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ জনাব হাবিবুর রহমান তালুকদার, ভারপ্রাপ্ত মহা-পরিদর্শক জনাব এ.

---

* জেলা ও দায়রা জজ, চাঁদপুর।

এফ. এম. রেজা-ই-করিম, রেজিস্ট্রেশন অফিসসমূহের পরিদর্শক জনাব রুস্তম আলী, নারায়ণগঞ্জের জেলা রেজিস্ট্রার জনাব আঃ বারীসহ বেশ কিছু সাব-রেজিস্ট্রারগণের সংগে আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতদ্ব্যতীত নিবন্ধ রচনায় কিছু মূল্যবান পুস্তকাবলী ও সরকারী নির্দেশাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে যা পুস্তক-বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া নিজের চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা এ লেখনীতে কাজে লাগান হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

রেজিস্ট্রেশন আইনের বিভিন্ন ধারার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইনের বিভিন্ন ধারা সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কিত। বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করার উদ্দেশ্যে বহু পরীক্ষিত রেজিস্ট্রেশন আইনের কোন ধারা পরিবর্তন করলে ঐ সকল আইনের ধারাসমূহ পরিবর্তন করতে হয়। তাই খুব সতর্কতার সাথে চিন্তা-ভাবনা করে রেজিস্ট্রেশন আইনের এবং রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির পরিবর্তনের সুপারিশ করতে হবে। বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়নের এমন সুচিন্তিত প্রস্তাব দিতে হবে যা কার্যকরি করা যায় এবং যা বাস্তবায়নে এই পদ্ধতি গতিশীল, সহজ ও জনকল্যাণকর হয়। চিন্তা-ভাবনা না করে যদি এই বহুল পরীক্ষিত পদ্ধতির অপসারণ অথবা পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়া হয় এবং তা কার্যকরী হয় তবে জনগণ পতিত হবে এক সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে এবং অসুবিধা দেখা দিবে প্রচলিত নিয়মে। তাই বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করার উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন আইন এবং বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির যা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা যেতে পারে তার মধ্যেই এ সমীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন আইনের ক্রমবিকাশ

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জের আমলে রেজিস্ট্রীকরণ আইন সর্বপ্রথম বংগীয় বিধিবদ্ধ আইন নামে প্রাদেশিক আইন হিসেবে জন্মলাভ করে। উক্ত আইনের ১৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ত্রিবিধ ক্ষমতা নিয়ে যথা—দলিল, রেজিস্ট্রীকরণ, জরীপকরণ ও নামজারীকরণের প্রথম রেজিস্ট্রার মিঃ এডওয়ার্ড টিরেটা নিয়োগ লাভ করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিস্তারিত আইন প্রণয়ন ও উক্ত ত্রিবিধ ক্ষমতা পৃথকীকরণের তাগিদে ১লা মে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত আইন পূর্ববর্তী আইনের সাথে সংযোজিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম হিন্দুদের 'দত্তক' গ্রহণ ও সম্পত্তি উইল করার বিধান প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের আওতায় সর্বপ্রথম কলকাতার বাইরে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় তিনটি পৃথক রেজিস্ট্রী অফিস স্থাপন করা হয় এবং অফিসগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয় দেওয়ানী আদালতের

রেজিষ্ট্রার (Registrar)-এর উপর। প্রকৃতপক্ষে এই আইনের বিধানসমূহ রাণী এ্যানের রাজত্বকালে ইয়র্ক শ্যায়ারের রেজিষ্ট্রীকরণ আইনের অনুকরণে প্রণীত হয়।

পরবর্তীকালে ১৭৯৩ সালে বিধানাবলীকে সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সময়োপযোগী করার জন্য বিভিন্ন সময় নতুন আইনের সংযোজন ও পুরাতনের সংশোধন করা হয়। তখনই কাজিউল কাজ্জাত (Head Kazi of Bengal)-এর পদ সৃষ্টি করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বেশ কিছু সংখ্যক জেলায় নিয়োগ করে তাঁদের অধিক্ষেত্রভুক্ত দলিলাদি সংরক্ষণ ও অনুলিপি সরবরাহ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৭৯৩ সালের সামগ্রিক বিধানাবলী ১৮০৩ সালে পুনরায় বিধিকরণ করে সাধারণ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা ১৮০৫ সালে উড়িষ্যার কটক অবধি বিস্তৃতিলাভ করে।

১৮৩৮ সালে সর্বপ্রথম উপ-রেজিষ্ট্রার (Sub-Registrar)-এর অফিস প্রতিষ্ঠার আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৮৪৩ সালে প্রণীত আইনের দ্বারা রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলসমূহকে অরেজিষ্ট্রীকৃত (Un-Registered) দলিলাদির তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়ার সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়। এরপর ১৮৪৭, ১৮৫১, ১৮৫৬, ১৮৫৯ সালে রেজিষ্ট্রীকরণ আইনের ধারাবাহিকতা বাজায় রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সময়োপযোগী করে সংশোধন করা হয়।

পরবর্তীকালে ১৮৬৪ সালে Act XVI দ্বারা সর্বপ্রথম ১৭৯৩ সালের প্রাদেশিক বিধানাবলীকে বাতিল করে General Registration Act প্রণয়নকরত ১লা জানুয়ারী, ১৮৬৫ সাল হতে কার্যকর করা হয়।

এরপর ১৯৬৬ সালে সংযোজিত নতুন আইন দ্বারা রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতির এক আমূল পরিবর্তন করে দলিল সম্পদানকারী ছাড়াও সম্পাদনকারীর অন্য যে কোন প্রতিনিধি দ্বারা দলিল দাখিল করার বিধান প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৭১ সালে Registrar Gereral-এর পদ বাতিল করে নতুন ও বর্ধিত দায়িত্ব দিয়ে Inspector General of Registration-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ১৮৬৫, ১৮৬৬, ১৮৬৮, ১৮৭১, ১৮৭৭, ১৮৭৯, ১৮৮৩, ১৮৮৬, ১৮৮৮, ১৮৮৯, ১৮৯১ ও ১৮৯৯ সালে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে মূল আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে যুগের চাহিদা মেটানো হয়।

সর্বশেষ ১৯০৮ সালে পূর্বের সকল বিক্ষিপ্ত আইন ও বিধানগুলোকে সংকলিত করে বর্তমানে রেজিষ্ট্রেশন আইন Act XVI প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে যে পরিপূর্ণরূপ দেখা যায় তা বস্তুত ১৯০৮ সালের সংকলন ও সঞ্চয়ের ফল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯০৮ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইনকে সামগ্রিকভাবেই গ্রহণ (Adopt) করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ১৯০৮ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইন একই পরিসরে

বাংলাদেশে বলবৎ করা হয়, যদিও পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের ৩০ ও ৬৭ ধারা বিলুপ্ত করে জেলা নিবন্ধকের নিবন্ধন ক্ষমতা বাতিল করা হয়েছে।

এ ভাবে রেজিষ্ট্রেশন আইনের ক্রম ইতিহাসকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১৭৮১ সাল হতে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক আইন ও ঐচ্ছিক রেজিষ্ট্রীকরণের যুগ এবং ১৮৬৪ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সর্বভারতীয় সাধারণ আইন ও বাধ্যতামূলক রেজিষ্ট্রেশনের যুগ।

রেজিষ্ট্রেশন আইনের উদ্দেশ্য

একটি কার্যকর রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের লক্ষ্যে রেজিষ্ট্রেশন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্নিহিত ছিল :

(১) দলিলের বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদান ;
(২) আদান-প্রদান জনসাধারণে প্রচার ;
(৩) জাল-জালিয়াতি রোধ ;
(৪) কোন সম্পত্তি লেনদেন হয়েছে কিনা তা নিরূপণের সুযোগ সৃষ্টি ; এবং
(৫) স্বত্বের মূল দলিল হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হলে স্বত্ব সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।

রেজিষ্ট্রেশন আইনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। নতুবা আইনের কিছু কিছু বিধান দুর্বোধ্য ও অসংগত মনে হতে পারে।

রেজিষ্ট্রেশন আইনের মৌলিক দিক

১৯০৮ সালের রেজিষ্ট্রীকরণ আইন ১৫টি অংশে ও ৯১টি ধারায় বর্ণিত হয়েছে। মূল আইনের বিধানসমূহের প্রয়োগ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে ১১৮টি বিধি বলবৎ আছে। এ ছাড়া বিভাগীয় আদেশ-উপদেশ, কতিপয় সরকারী প্রজ্ঞাপন ও আদেশ রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির সহায়ক হিসেবে বলবৎ রয়েছে।

রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি

বাংলাদেশের রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত ধাপে হয়ে থাকে ; যথা :—

(ক) **দলিল প্রস্তুতকরণ :** উপযুক্ত পরিমাণ ষ্ট্যাম্প-কাগজে লিপিবদ্ধ নিদর্শন পত্রের নামই দলিল। প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করার পর ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করে কোন সনদপ্রাপ্ত দলিল লেখকের দ্বারা সঠিকভাবে দলিল প্রস্তুত করাতে হয়। দলিলদাতা বা দাতাগণ নিজ হাতে লিখে বা টাইপ করেও দলিল প্রস্তুত করতে পারেন। সম্পাদিত দলিলের মাধ্যমে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পত্তি আদান-প্রদান হয়ে থাকে। দলিল সম্পাদনের তারিখে দাতা এবং গ্রহীতা সম্পত্তি বা জমির পরিমাণ এবং এর মূল্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা

করবেন। স্থাবর সম্পত্তির দলিলের তফসিলে সম্পত্তির সনাক্তযোগ্য বিবরণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

রেজিষ্ট্রেশন অফিসার অসম্পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত স্থাবর সম্পত্তির দলিল রেজিষ্ট্রী করতে অস্বীকার করতে পারেন। সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ দলিলে অবশ্যই থাকতে হবে, যেন উক্ত সম্পত্তি সনাক্ত করতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। কি প্রকারে সম্পত্তির বিবরণ প্রদান করতে হয়, তা রেজিষ্ট্রীকরণ আইনের ২১ ধারায় বিধৃত রয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী দলিলে সম্পত্তির দাগ নং, খতিয়ান নং, এবং এলাকা ও এর আশপাশের রাস্তাঘাট বা স্মরণীয় স্থানসমূহের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

(খ) **দলিল দাখিলকরণ পদ্ধতি ও রেজিষ্ট্রীকরণ :** দলিল সঠিকভাবে সম্পাদন করা এবং কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী দ্বারা তা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির বৃহত্তর অংশ যে সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত সেই অফিসের সাব-রেজিষ্ট্রারের নিকট রেজিষ্ট্রীর জন্য দাখিল করতে হবে (২৮ ধারা)। দলিলদাতা বা দাতাগণের মধ্যে যে কোন একজন, দাতা বা গ্রহীতা একাধিক হলে, তাদের যে-কোন একজন, দাতা বা গ্রহীতার প্রতিনিধি, দাতা বা গ্রহীতার ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তার দলিল দাখিল করতে পারেন (৩২ ধারা)।

আমমোক্তারনামা সম্পর্কে রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৩০ ধারায় বলা হয়েছে যে, রেজিষ্ট্রার বা সাব-রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে অথবা সম্পাদনকারী বিদেশে থাকলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বা নোটারী পাবলিক অথবা কোর্টের জজের সম্মুখে তা সম্পাদন করতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তাগণ তা সত্যায়ন করবেন।

দলিল সম্পাদনের তারিখ হতে অনধিক ৪ মাসের মধ্যে জরিমানা ছাড়া (২৩ ধারা) এবং জেলা রেজিষ্ট্রারের অনুমতি সহকারে সম্পাদনের তারিখ হতে ৮ মাসের মধ্যে প্রকৃত ফিসের অনূর্ধ ১০ গুণ জরিমানা প্রদান করে দলিল রেজিষ্ট্রীর জন্য দাখিল করা যেতে পারে (২৫ ধরা)। দলিলদাতাকে তার নিজ গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সনাক্ত করবেন। দলিলদাতার পরিচিতি সম্পর্কে রেজিষ্ট্রার কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হলে এবং দাতা উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করলে রেজিষ্ট্রার দলিলটি রেজিষ্ট্রীর জন্য গ্রহণ করতে পারেন।

দাখিলকৃত দলিল রেজিষ্ট্রীভুক্তির ক্রমানুযায়ী সংশ্লিষ্ট বালাম বহিতে নকল করে রাখা হবে (৫২ (১) (গ) ধারা)।. দলিল নকল করার পর দলিলের সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীর সূচী করে (৫৫ ধারা) মূল দলিল দাখিলকারক অথবা তার প্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেয়া হবে (৬১ (২) ধারা)।

(গ) **দলিল দাখিল অগ্রাহ্যকরণ :** নিম্নবর্ণিত যে-কোন কারণে নিবন্ধন কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রীর জন্য দলিল গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন :

(১) দলিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বৃহত্তর অংশ নিবন্ধন কর্মকর্তার এলাকার অন্তর্ভুক্ত না হলে ;

(২) যদি দলিল সংশ্লিষ্ট জেলার সাধারণ ব্যবহৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ না হয়, অথবা দলিল নিবন্ধন কর্মকর্তার অবোধ্য কোন ভাষায় লিখিত হয় এবং বোধগম্য ভাষায় এর অনুবাদের অনুলিপি সংগে দাখিল না করা হয় (১৯ ধারা) ;

(৩) যদি দলিলে কৈফিয়ৎ ব্যতিরেকে ২ পংক্তির মধ্যে লেখা, পংক্তিতে শূন্যস্থান, ঘষামাজা বা কোন পরিবর্তন থাকে (২০ ধারা) ;

(৪) যদি দলিলে লিখিত সম্পত্তির বিবরণ সনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত না হয় ;

(৫) যদি অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে দলিল দাখিল না করা হয় (২৩-২৬) ধারা) ;

(৬) যদি দলিল উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাখিল করা না হয় (৩২, ৩৩, ৪০ ধারা)।

প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্পের কাগজে দলিল লিপিবদ্ধ করা না হয়ে থাকলে তা আটক করে কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করা হয় (ষ্ট্যাম্প এ্যাক্টের ৩৩ ধারা) এবং কালেক্টর বিবেচনা করে অনাদায়ী ষ্ট্যাম্প শুল্ক উদ্ধার ও জরিমানা আদায় করার পর দলিল রেজিষ্ট্রী করা হয়।

(ঘ) **দলিল রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্যকরণ :** নিম্নবর্ণিত কারণে সম্পাদিত দলিল রেজিষ্ট্রী অগ্রাহ্য হয় :

(১) দলিলদাতা দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করলে (৩৫ ধারা) ;
(২) দলিলদাতা নাবালক, নির্বোধ বা পাগল হলে (৩৫ ধরা ৩-খ) ;
(৩) মৃত দাতার ওয়ারিশ দলিল সম্পাদন অস্বীকার করলে (৩৫ ধারা ৩-গ) ;
(৪) দলিলের ফিস্ পরিশোধ না করা হলে (৮০ ধারা) ;
(৫) নিবন্ধন কর্মকর্তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী দাতা সনাক্ত না হলে ;
(৬) প্রয়োজনীয় আয়কর দায়মুক্তির প্রত্যয়নপত্র দাখিল না করা হলে (আয়কর অধ্যাদেশ ১৮৪ ধারা) ;
(৭) দলিলের সংগে হলফনামা সংযুক্ত না করা হলে (১৮২/৭২ অধ্যাদেশের ৪ নং ধারা)।

(ঙ) **কমিশন ও ভিজিট :** দাতা কর্তৃক সম্পাদিত দলিল পরীক্ষার জন্য বা দাখিল গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কমিশন/ভিজিটের আবেদন করতে পারেন (৩৮ ও ৩৩ ধারা) ;

(১) শারীরিক অক্ষমতার কারণে অফিসে উপস্থিত হতে অপারগ ব্যক্তি ;
(২) কারাগারে আবদ্ধ ব্যক্তি ;
(৩) পর্দানশিন মহিলা।

প্রত্যেক দলিলে কমিশনের জন্য 'কে' দফায় ১০.০০ টাকা এবং দলিল দাখিলের জন্য 'জে' দফায় ৩৫.০০ টাকা ফিস এবং এর সাথে গ্রামাঞ্চলে প্রতি মাইল ভ্রমণের জন্য কর্মকর্তা এবং তার পিয়নকে যথাক্রমে ১.০০ এবং ০.৪০ টাকা হারে এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম শহরের জন্য ২৫.০০ টাকা এবং অন্যান্য শহরের জন্য ১০.০০ টাকা হারে খরচা প্রদান করা হবে।

(চ) **মামলা ও আপীল :**

(১) সম্পাদন অস্বীকার করার কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে সাব-রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করলে এবং সম্পাদন অস্বীকার করার কারণে রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য হলে, উক্ত অগ্রাহ্য আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট (যথাক্রমে ৭২ ও ৭৩ ধারা) আপীল আবেদন করা যেতে পারে।

(২) অগ্রাহ্য আদেশের প্রথম অনুলিপি/নকল গ্রহণের জন্য কোন ফিস বা ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয় না।

(৩) জেলা রেজিস্ট্রার আপীলের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণপূর্বক রেজিস্ট্রীর জন্য আদেশ প্রদান করলে, উক্ত আদেশ দানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট উক্ত আদেশসহ দলিলটি রেজিস্ট্রীর জন্য পুনরায় দাখিল করতে হয় (৭৫ ধারা)।

(৪) জেলা রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করলে জেলা রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলা করা যায় (৭৭ ধারা)।

(৫) দেওয়ানী আদালত রেজিস্ট্রীর আদেশ প্রদান করলে উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রী অফিসে দলিলটি রেজিস্ট্রীর জন্য পুনরায় দাখিল করতে হয়।

রেজিষ্ট্রেশন আইনের সীমাবদ্ধতা

রেজিষ্ট্রেশন আইনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মূল্যায়ন করতে হলে এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এগুলো নিম্নরূপ :

(১) দলিলের রেজিষ্ট্রেশনই এর সম্পাদনের সন্দেহাতীত প্রমাণ নয় ;

(২) শুধুমাত্র রেজিস্ট্রী হলেই কোন দলিল স্বত্বাধিকার প্রমাণ করবে না বা এর বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রমাণিত হবে না ;

(৩) কোন দলিল বে-আইনী বা প্রবঞ্চনামূলকভাবে তৈরী হলে কেবল রেজিষ্ট্রেশন একে বিশুদ্ধতা প্রদান করতে পারবে না।

রেজিষ্ট্রেশন আইনের রেজিস্ট্রীযোগ্য দলিলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ও (খ) অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল ছাড়া অন্য সবরকম দলিলকে ব্যাপক অর্থে অস্থাবর সংক্রান্ত দলিল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উইল ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দানপত্র, অন্য প্রকার দলিল, রশিদপত্র, লীজ দলিল বা কোর্টের ডিক্রি যা দ্বারা একশত বা তদূর্ধ মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তির শর্তসূচক বা কায়েমী অধিকার স্বত্বাগম, স্বার্থ–সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবে, জ্ঞাপন করবে, হস্তান্তর, সীমিত বা বিলোপ সাধন করবে, সে সমস্ত দলিলের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। তদুপরি উইল ছাড়া অন্যান্য কোন দলিল দ্বারা যদি কোন দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয় তার রেজিষ্ট্রীও বাধ্যতামূলক। অন্যান্য সকল প্রকার দলিলের রেজিষ্ট্রী বাধ্যতামূলক নয়। এ প্রসংগে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২–এর ৪ ধারায় আইনের ৫৪, ৫৯, ১০৭ ও ১২৩ ধারাকে রেজিস্ট্রেশন আইনের সম্পূরক বলে বলা হয়েছে। এই ধারা মতে কিছু কিছু দলিলের রেজিষ্ট্রী বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যদিও রেজিষ্ট্রী আইনে এগুলো রেজিষ্ট্রী বাধ্যতামূলক নয়। তদুপরি প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৯ ধারায় ১০০ টাকার কম মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির দলিল রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অতএব দেখা যায় রেজিস্ট্রেশন আইনের ১৭ ধারায় বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার দলিলের (মূল্যমান নির্বিশেষে) রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ১৮৮২ সনে ষ্ট্যাম্প আইনের ৫ ধারামতে অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ট্রাষ্ট দলিলের রেজিষ্ট্রী বাধ্যতামূলক। আবার রেজিস্ট্রেশন আইনের ১৭ ধারা ও সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারা মতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দান (উইল ব্যতীত) অবশ্যই রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে, অন্যথায় সিদ্ধ হবে না। কিন্তু মুসলমান আইন অনুসারে দান মৌখিকভাবে করারও বিধান আছে। এ ব্যক্তিগত আইনের বিধান সাধারণ আইনের উপর প্রবল থাকবে। অতএব দেখা যায় যে, প্রচলিত অন্যান্য আইনের যে সমস্ত বিধান রেজিস্ট্রেশন আইনের সম্পূরক বলে বলা হয়েছে, সে সমস্ত বিধান, দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

রেজিস্ট্রেশন আইনে রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তার ক্ষমতা

রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তার কার্যক্রমকে দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা মোতাবেক জুডিসিয়েল কার্যক্রম বলে গণ্য করা হয়েছে। রেজিষ্ট্রী আইনের ৪১ ধারার কার্যক্রমে সি. আর. পি. সি ১৯৫ ধারা অনুসারে রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তা কোর্ট। আইনে ৭৫ ধারার কার্যক্রম আধা–বিচারিক (Quasi–Judicial) ও ৮০ (চ) ধারায় রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তা সি. আর. পি. সি'র ৪৮০, ৪৮১ ধারা মতে কোর্ট হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। রেজিস্ট্রেশন আইনটি প্রকৃতিগতভাবে কিছু

কিছূ ক্ষেত্রে বিচারিক (Substantive Judicial) হলেও সার্বিকভাবে রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াটি আধা-বিচারিক (Quasi-Judicial)।

রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তাকে দলিল রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক ও বিচারিক উভয়বিদ দায়িত্ব পালন করতে হয়। রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৩৪ ও ৩৫ ধারায় রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। দলিলদাতা তার সামনে উপস্থিত হয়ে দলিল সম্পাদন স্বীকার করলে, উপযুক্তভাবে সনাক্ত হলে ও প্রচলিত অন্যান্য আইনের আনুষ্ঠানিকতা পালিত হলে সাব-রেজিষ্ট্রার দলিলখানি রেজিষ্ট্রী করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে তার সুবিবেচনার কোন অবকাশ নেই। রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৩৫ ধারা সম্পর্কিত রেজিষ্ট্রেশন বিধিমালার ৪২ নং বিধিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, দলিলের বৈধতা পরীক্ষা করা সম্পূর্ণভাবে তার এখতিয়ার বহির্ভূত। কোন দলিলে বিক্রিত জমি, দাতার নিজের কিনা, তাতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির স্বার্থহানি হবে কিনা, দলিলটা প্রবঞ্চনামূলক বা গণস্বার্থ বিরোধী কিনা, বা তাতে শান্তিভংগ হবে কিনা ইত্যাদি রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তার বিবেচ্য বিষয় নয়। এগুলো উপযুক্ত আদালতের বিচার ও সিদ্ধান্তের বিষয়। রেজিষ্ট্রেশন সারগ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে মহা-পরিদর্শকের উপদেশ ও আদেশাবলীর ৯৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন দলিলের বিষয়বস্তু নৈতিকতার পরিপন্থী বা নীতি বিগর্হিত হলে বা কোন শিশু কন্যাকে বেশ্যালয়ে বিক্রি করা হলে বা কোন বে-আইনী শর্ত আরোপ করা হলেও রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তা দলিল রেজিষ্ট্রী করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবেন না। বরং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেজিষ্ট্রারের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। স্পষ্টত রেজিষ্ট্রেশন আইনে বিবৃত পন্থায় যথাযথভাবে কোন দলিল উপস্থাপিত হলে কোন অজুহাতেই রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তা যাতে তা রেজিষ্ট্রী করতে অস্বীকার না করেন সেজন্য কড়া সাবধানবাণী বারবার উচ্চারিত হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনসাধারণ কর্তৃক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত যে-কোন আদান প্রদানের দলিল রেজিষ্ট্রী করে তার রেকর্ড সংরক্ষণ ও জনসাধারণে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি। আইনের বিধান মতে দলিল রেজিষ্ট্রী হলে তাতে কোন স্বত্ব, স্বামীত্ব বা অধিকার সৃষ্টি হল কিনা তা সম্পূর্ণভাবে আদালতের বিবেচ্য বিষয়। সাব-রেজিষ্ট্রার নিজে বিচারকের আসনে বসলে তাতে ক্ষমতা অপব্যবহার হবার, জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ার ও রেজিষ্ট্রেশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা রোধ করার জন্যই রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তার ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছে। দলিল রেজিষ্ট্রী হলেই কেউ তা দিয়ে অন্যায় সুযোগ লাভ করতে পারবে রেজিষ্ট্রেশন আইন এরূপ ধারণাকেও বাতিল করেছে।

বিশেষ প্রতিকার আইনের ৩(গ) ও ৫০ (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, রেজিষ্ট্রেশনের বিরুদ্ধে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অচল। হাইকোর্টের রুলিং অনুসারে উপযুক্ত ও বৈধভাবে দলিল রেজিষ্ট্রীর জন্য উপস্থাপিত হলে রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তাকে তা রেজিষ্ট্রী করা থেকে বিরত করা যাবে না এবং রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তার কার্যক্রম থেকে বিরত করার কোন এখতিয়ার আদালতের নেই।

বিধানসমূহ আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও রেজিষ্ট্রেশন আইনের উদ্দেশ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ। এও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, রেজিষ্ট্রেশন আইনের এ কঠোরতা জনকল্যাণে একে কার্যত অধিকতর সফল প্রমাণ করেছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রেজিষ্ট্রেশন আইন

১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনার অভিযাত্রা আরম্ভ হয়েছে। কৃষি প্রধান এ দেশে ভূমি মালিকানার আভিজাত্য সনাতন বাংলার সমাজ ব্যবস্থার এক স্বীকৃত ধারণা। আজও আমরা কম-বেশী সকলে এ ব্যাপারে মোহাচ্ছন্ন। ভূমি মালিকানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ যাবতকাল বহুবিধ আইন প্রণীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ দেশের মামলা-মোকদ্দমা, ঝগড়া-কোন্দলের বেশীর ভাগই জমিজমাকে কেন্দ্র করে। তার কারণ আমাদের ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার। এ দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের উদারতার ফলে নিয়ত ভূমি মালিকানা পরিবর্তনের জটিলতা হাজার ডাল-পালায় বিস্তৃত হয়েছে। আর সম্ভবত এ কারণেই কোন জরীপই ভূ-সম্পত্তির মালিকনা নিরূপণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। কাজটি সত্যিই জটিল। একটি কার্যকর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করার চিন্তা-ভাবনা চলছে নিরন্তর। কিন্তু আজও পূর্ণ সফলতা নিশ্চিত হয়নি। বর্তমানে ভূমি সংস্কারের চিন্তা-ভাবনা নতুন করে চলছে। কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গেছে এ উদ্যোগ চলতে থাকলে আগামী ১৮ বছরের মধ্যে একটা কার্যকর ভূমি মালিকানা রেকর্ড নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ থেকে জটিলতার মাত্রা অনুমান করা যায়।

প্রাসংগিক কারণে প্রশ্ন এসেছে ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে জটিলতা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সার্বিক জটিলতায় তার অবদান শতকরা কত ভাগ? বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা দলিল রেজিষ্ট্রী প্রক্রিয়ার সূচনা-লগ্ন থেকেই চলে আসছে। ভূ-সম্পত্তির হস্তান্তর দলিলের রেজিষ্ট্রীর জন্য ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৯ ধারার বিধান মতে বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর নোটিশ প্রদান করতে হয়। এ নোটিশের ফলে হস্তান্তরিত জমির নামজারী ও মিউটেশন করার কথা। কিন্তু কার্যত তা খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। ভূমি প্রশাসনের মতে এ সমস্ত নোটিশ তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য না হওয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। অভিযোগটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নোটিশ যাতে তথ্যবহুল, সুখপাঠ্য হয় এ ব্যাপারে রেজিষ্ট্রী কর্মকতাগণ অত্যন্ত সজাগ। ভূমি প্রশাসন ও রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে আন্তরিক না হলে এ অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ চলতেই থাকবে। তার সমাধান বিকল্প কোন চিন্তা ভাবনা করে করা যাবে না। এক হাতে জমি হস্তান্তরের দলিল রেজিষ্ট্রেশন ও মিউটেশনের দায়িত্ব দেয়া হলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিবে ও জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়বে। কারণ নামজারী ও দলিল রেজিষ্ট্রী তখনই এক সাথে সম্ভব যখন নির্ভুলভাবে এ

দেশের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিকানা রেকর্ড করা সম্ভব হবে। বর্তমান অবস্থাতে রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া থেকে জনসাধারণ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে যে সুবিধা পাচ্ছে তা ব্যাহত হলে সার্বিক অবস্থা আরও জটিল হবে। রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া নিবন্ধের শুরুতে বর্ণিত উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে এবং রেজিষ্ট্রেশন আইন প্রণয়নকালে ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতাও বিবেচ্য ছিল। প্রশাসনকে একীভূত করার চিন্তা তখন ছিল না। কারণ দলিল শুধু জমি-জমা হস্তান্তর ছাড়াও বহুবিধ কারণে প্রণীত হয়। ভূমি সংস্কারের সহায়তার জন্য ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪২-এর মাধ্যমে ৬ দফা সম্বলিত হলফনামা বাধ্যতামূলকভাবে জমি-জমার হস্তান্তর দলিলের সংগে সংযোজনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাল-জালিয়াতি রোধের জন্য রেজিষ্ট্রেশন আইনের ২৮ ধারা সংশোধন ও ৩০ ধারা বাতিল করা হয়েছে। তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। রেজিষ্ট্রী আইন বা রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ ভূমি সংস্কারে কোন জটিলতা সৃষ্টি করেনি।

রেজিষ্ট্রেশন আইনের সাথে অন্যান্য আইনের সম্পর্ক

রেজিষ্ট্রেশন আইনের সাথে মোটামুটিভাবে সাধারণ দফা আইন (General Clauses Act), সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, চুক্তি আইন, অছি অইন (Jrust Act), সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (Specific Relief Act), সাবালকত্ব আইন, জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, আয়কর আইন, সমবায় আইন ও দেওয়ানী কার্যবিধির কতিপয় বিধানের সম্পর্ক রয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় উল্লেখিত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

রেজিষ্ট্রেশন আইনের পরিধি

সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থাৎ বর্তমান প্রশাসনিক জেলা বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও রাংগামাটি ব্যতীত সারা দেশে এই রেজিষ্ট্রেশন আইন বলবৎ রয়েছে।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের অবকাঠামো

পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সারা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখাকে ৪৯টি রেজিষ্ট্রীকরণ জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। দেশের থানা পর্যায়ে সর্বমোট ৪৭৫টি উপ-রেজিষ্ট্রারের অফিস রয়েছে। ২২টি থানায় একের অধিক অফিসও রয়েছে। উপ-রেজিষ্ট্রারের অফিসগুলোই রেজিষ্ট্রীকরণের মূল ইউনিট হিসেবে পরিগণিত। রেজিষ্ট্রীকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়া সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিসেই নিষ্পন্ন হয়। জেলা রেজিষ্ট্রারগণ অধঃস্তন কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ, অধঃস্তন অফিস পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও সাব-রেজিষ্ট্রারের বিতর্কিত আদেশের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

এ ছাড়া রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সামগ্রিক প্রশাসনের দায়িত্ব রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন রেজিস্ট্রী পরিদপ্তর।

রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

মহা-পরিদর্শক

সহকারী মহা-পরিদর্শক-১ | পরিদর্শক -২ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ | প্রধান সহকারী-১ | উচ্চমান সহকারী-৬ | নিম্নমান সহকারী-১২ | অন্যান্য ২৮

জেলা রেজিস্ট্রার: প্রধান সহকারী-১ | নিম্নমান সহকারী-১ | টি, সি, সহকারী-১ | অন্যান্য -৩

সাব-রেজিস্ট্রার: নিম্নমান সহকারী-১ | মোহরার -১ | টি, সি, মোহরার-১ | পিয়ন-১

বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকরণ পদ্ধতি ও আনুষংগিক বিষয়াদি আধুনিকায়ন প্রসংগে

১৯০৮ সনে প্রণীত রেজিস্ট্রেশন আইন ও প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও পশ্চাদপদতা সম্পর্কে প্রায়ই প্রশ্ন তোলা হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও ভূমি ব্যবস্থাপনার আলোকে এ আইনটির ও প্রক্রিয়ার কিছু আধুনিকায়ন হওয়া দরকার।

রেকর্ড সংরক্ষণ

দলিল রেজিস্ট্রীকরণের পর এর সূচীকরণ সম্পূর্ণ করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য দলিল সাব-রেজিস্ট্রী অফিস হতে জেলা সদর রেকর্ড রুমে পাঠিয়ে দেয়া রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির একটা প্রধান অংগ। জনগণ তাদের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বাংলাদেশে ৪৭৫টি সাব-রেজিস্ট্রী অফিস ও ৪৯টি জেলা রেজিস্ট্রী অফিস রয়েছে। ৪৭৫টি সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের মধ্যে ১৬৫টি অফিস নিজস্ব ভবনে ও বাকী ৩১০টি অফিস ভাড়াটিয়া গৃহে অবস্থিত। ৪৯টি জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের মধ্যে ২২টি অফিস নিজস্ব গৃহে এবং বাকী ২৭টি অফিস ভাড়াটিয়া গৃহে অবস্থিত।

দেশের অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রী অফিস গৃহ অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ণ এবং প্রকট স্থানাভাবের দরুন সেগুলোতে পুঞ্জিভূত রেকর্ড-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে পুরাতন জেলা সদর রেকর্ড রুমগুলোতে স্থানাভাবের দরুন এবং

নতুন সৃষ্ট জেলাগুলোতে এখনও জেলা রেজিষ্ট্রারের অফিস ও রেকর্ড রুম নির্মিত না হওয়ায় মফঃস্বল অফিসগুলোর রেকর্ডসমূহ জেলা সদরে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হচ্ছে না এবং নতুন জেলা সৃষ্টির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বহু অফিসের রেকর্ড নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই বিভাগটির মফঃস্বল অফিসসমূহের উপযুক্ত গৃহায়ন এবং নবসৃষ্ট জেলাগুলোতে রেকর্ড রুমসহ জেলা রেজিষ্ট্রারের কার্যালয় নির্মাণের ব্যাপারে একটি কার্যক্রম একান্তই আবশ্যক এবং উক্ত কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং দেশের সমস্ত রেজিষ্ট্রী অফিস গৃহগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে একটি বিভাগীয় প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টির বিষয়টিও বোধ হয় বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। কেননা গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে এ বিভাগের অফিস গৃহগুলোর একান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে সবসময়ে সময়মত এবং আশানুরূপ সাড়া ও সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থায় মাইক্রোফিসের প্রচলন অবশ্যই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। প্রায় ৫০ বৎসর কাল সময়ের রেকর্ড থেকে জনগণ সাধারণত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ৫০ বছরের পূর্বের যে সমস্ত রেকর্ড রয়েছে তা মাইক্রোফিসের সাহায্যে সংরক্ষণ করে রাখলে আরও দীর্ঘদিন ধরে এর ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং তা ধ্বংসের হাত হতে রক্ষাও পেতে পারে। মাইক্রোফিসের মাধ্যমে ৫০ বছরের অধিককালের রেকর্ডগুলো সদর রেকর্ড রুম হতে সরিয়ে নিলে ঐ স্থানে নতুন রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে,যার দ্বারা বর্তমান সমস্যার আশু সমাধান হবে।

দলিল লেখন পদ্ধতি সহজীকরণ

বর্তমান দলিল লেখন পদ্ধতি আধুনিক, গতিশীল এবং সহজ নয় বলে মনে হয়। বর্তমানে কিছু লীজ, আমোক্তারনামা এবং ব্যাংকের মর্টগেজ দলিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে দলিল লেখকগণের হাতের লেখা দলিল রেজিষ্ট্রীর জন্য গৃহীত হয়ে আসছে। ঐগুলোর মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেক দলিলের কলেবর প্রায়শই বেশ স্ফীত থাকে। অনেকে তা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন এবং আধুনিক, গতিশীল ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত এবং ছাপানো ফরমে হওয়া উচিৎ বলে মত পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ মত যে সঠিক এবং বাস্তবসম্মত নয় তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করে থাকেন। ষ্ট্যাম্প আইনের ১ নং তপসীলে ৬৫ রকম দলিলের বর্ণনা আছে। দলিলের ভিন্নতা, অর্জিত স্বত্বের বর্ণনার বৈচিত্র, দাতা–গ্রহীতার সংখ্যাধিক্য ও হস্তান্তরিত জমির সুদীর্ঘ বর্ণনার ক্ষেত্রে একই ধরনের ছাপানো ফরম প্রয়োগ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। কাজেই দলিল লেখন পদ্ধতিটিকে আধুনিক, গতিশীল ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সমস্ত প্রকার দলিলই নির্ধারিত ফরমে লেখার নিয়ম বা বিধি প্রবর্তনের তেমন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। তবে সুস্পষ্ট লেখা, সহজবোধ্যভাবে এবং নির্ভুল ভাষায় দলিল লেখন পদ্ধতিটির উৎকর্ষতার লক্ষ্যে দলিল

লেখকদের যোগ্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

দলিল লেখকের সনদের জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ হতে হবে এবং উক্ত সনদ লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উক্ত পরীক্ষা নির্ধারিত সিলেবাস অনযায়ী রেজিষ্ট্রী পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

এ পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য দলিল লেখক নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

দলিল ফেরৎ দেয়ার ব্যবস্থা সহজীকরণ ও নামজারীর আশু ব্যবস্থা

বর্তমানে প্রচলিত দলিল রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের জন্য দলিল রেজিষ্ট্রীর সময় দলিলের সংগে সংশ্লিষ্ট পক্ষের খরচে সরকারের নিযুক্ত নকল নবীশ প্রস্তুত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এর তিনটি প্রতিলিপি দাখিল করার বিধান রাখা যেতে পারে। প্রতিলিপিটির পৃষ্ঠাসমূহ বালামের পৃষ্ঠার ছকে ও পরিমাপে তৈরী হবে। মূল দলিলটি রেজিষ্ট্রীর জন্য গ্রহণ করার পর প্রতিলিপির সংগে সামঞ্জস্য সাধন করে রেজিষ্ট্রী কার্য সম্পন্ন করার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে পক্ষকে ফেরৎ দেয়া হবে এবং প্রতিলিপিটি আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করার পর বালামের আকারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হবে। তৃতীয় প্রতিলিপিটি নামজারীর জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)/থানা রাজস্ব অফিসারের নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) তা প্রাপ্তির পর আইনে বর্ণিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নামজারী করবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাব-রেজিষ্ট্রার দলিলের প্রতিলিপি সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসারের কাছে না পাঠালে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নামজারী না করলে আইনগতভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা। পদ্ধতিটি রেজিষ্ট্রেশন আইনের সামান্য সংশোধনের পর চালু করা যেতে পারে। এবং অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অতি সহজে চালু করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে দলিল লেখকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনপক্ষে এস, এস, সি, পাশ নির্ধারণ করে তাদের সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে প্রক্রিয়াটির প্রচলন সহজসাধ্য হবে। ১৯৭৮ সন পশ্চিমবংগে দলিল রেজিষ্ট্রীর এই প্রক্রিয়া চালু করেছে।

পরিবর্তিত প্রক্রিয়ায় রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৮৯ ধারায় নূতন বিধান সংযোজনপূর্বক "অবিকল নকল প্রণয়ন রীতি" ও "দলিল ফাইলকরণ রীতি" ২টি নিয়মাবলী আইনসিদ্ধ করে প্রবর্তন করতে হবে এবং এতে রেজিষ্ট্রেশন আইনের বর্তমান ১৯, ৪৫, ৪৬, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬ (৪) ধারাসমূহ উপযুক্তভাবে সংশোধন করতে হবে।

প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ায় দলিল ফাইলকরণের নিমিত্তে বিভিন্ন ক্রমিক তারিখ যুক্ত বহির ফাইলসমূহ বাঁধাইপূর্বক স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ব্যবস্থা প্রয়োগের ফলে যদি কোন নকল নবীশ কর্মচ্যুত হয়, তবে তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থা রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে সহজতর ও গতিশীল করবে।

ভূয়া মালিক কর্তৃক জমি হস্তান্তর ও জাল-জালিয়াতি প্রসংগে

বর্তমানে সারা দেশে ৪৭৫টি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে বছরে প্রায় ৪০ থেকে ৪২ লক্ষ দলিল রেজিষ্ট্রী হয়ে থাকে। সংখ্যানুপাতে জাল-জালিয়াতির হার অত্যন্ত নগণ্য। তদুপরি জাল-জালিয়াতি রোধ করার জন্য রেজিষ্ট্রেশন আইনের ২৮ ধারা সংশোধনপূর্বক রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তার অধিক্ষেত্রে সীমিত করা হয়েছে এবং রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৩০ ধারা রদ করে জেলা রেজিষ্ট্রারের রেজিষ্ট্রী করার ক্ষমতা সংহরণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে জাল-জালিয়াতি আরও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

তথাপি জাল-জালিয়াতি যে হয় না তা বলা যায় না। যে-সব ক্ষেত্রে জালিয়াতি হয় তা প্রদর্শনপূর্বক এর প্রতিকারের সুপারিশ নিম্নে দেয়া হল :

(১) অনেকে মনে করেন সাব-রেজিষ্ট্রার হস্তান্তরিত জমির মালিকানা যাচাই না করার দরুন অনেক ভুয়া মালিকও দলিল রেজিষ্ট্রী করতে পারে।

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, রেজিষ্ট্রেশনের উদ্দেশ্যে জমি-জমা আদান-প্রদানের প্রামাণিক নিদর্শন সৃষ্টি, যা বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতার মাঝে জনগণের রক্ষাকবচ।

রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৪৭ ধারার বিধান মতে দলিলের কার্যকারিতা দলিল সম্পাদনের তারিখ হতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু আইনের ২৩ ধারার বলে দলিলটি সম্পাদনের তারিখ থেকে ৪ মসের মধ্যে যে-কোন সময় রেজিষ্ট্রীর জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। কাজেই হস্তান্তর কার্যকর হওয়ার পর পূর্ব-স্বত্ব যাচাইয়ের কোন গুরুত্ব থাকে না। সংগত কারণেই অনুরূপ কোন এখতিয়ার সাব-রেজিষ্ট্রারকে দেয়া হয় নাই। দলিল সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করলে ও প্রচলিত অন্যান্য আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হলে সাব-রেজিষ্ট্রার দলিল রেজিষ্ট্রী করতে বাধ্য। রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৩৪ ও ৩৫ ধারায় ও বিধিমালার ৪২ ধারায় অনুরূপ নির্দেশনাই রয়েছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৩ ধারা মতে ক্রেতা সম্পত্তির স্বত্ব ও বিক্রয়-পূর্ব অবস্থা অবগত আছেন এ ধারনাই সমর্থন করে। সাব-রেজিষ্ট্রার রেজিষ্ট্রেশন আইনের ২১ ধারা মতে হস্তান্তরিত জমির বর্ণনা পরীক্ষা করেন। ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা ও উত্তরাধিকার আইনের নিরিখে হস্তান্তরিত সম্পত্তির পূর্ব-স্বত্ব যাচাই এক জটিল প্রক্রিয়া। বিতর্কিত ক্ষেত্রে সম্পত্তির স্বত্ব যাচাই একমাত্র আদালতেরই এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। এরূপ পূর্ব-স্বত্ব

যাচাই করার দায়িত্ব সাব–রেজিষ্ট্রারকে প্রদান করলে দলিল রেজিষ্ট্রী বিলম্বিত ও অনিশ্চিত হবে। দুর্নীতি ও জনগণের হয়রানী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে রেজিষ্ট্রেশনের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাব–রেজিষ্ট্রার কর্তৃক হস্তান্তরিত জমির পূর্ব–মালিকানা পরীক্ষা করা ছাড়া নিম্নলিখিতভাবে ভূয়া মালিক কর্তৃক জমি হস্তান্তর ও জাল–জালিয়াতি রদ করা যায় ঃ

(ক) দলিলদাতাকে সনাক্তকরণ পদ্ধতি সংশোধন করে এক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দলিলদাতার ফটো দলিলের সংগে সংযোজন করার কথা। দলিলদাতার ফটো দেয়ার ব্যবস্থা চালু করলে জাল–জালিয়াতি ধরা পড়বার ভয়ে কেউ ভূয়া দলিল করতে সাব–রেজিষ্ট্রী অফিসে আসবে না।

(খ) ভূমি হস্তান্তর দলিল রেজিষ্ট্রীর সময় আয়কর পরিশোধ সার্টিফিকেটের ন্যায় ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলা ব্যতিরেকে জমি রেজিষ্ট্রী না করার বিধান করা। এতে একদিকে উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে দাতার মালিকানা স্বত্ব কিছুটা যাচাই করা হবে।

(গ) ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ১৪২ নং আদেশ মতে দাতাকে এ মর্মে হলফনামা দিতে হয় যে, তার দলিলে বর্ণিত জমি হস্তান্তর করার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। এই হলফ নামা দলিলের অংশ হিসেবে গণ্য হয়। রাষ্ট্রপতির এই আদেশের কোন রুলস করা হয়নি। এই আদেশের রুলস প্রণয়ন করে তাতে যদি ভূয়া দাতাকে কঠোর শাস্তি দেয়ার বিধান করা যায় তবে জাল–জালিয়াতি অনেকাংশে কমে যাবে।

(ঘ) রেজিষ্ট্রী আইনের ৩৪(৩) (বি) ধারায় দলিলদাতার সঠিক পরিচিতি সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট হতে বলা হয়েছে। বর্তমানে দলিলদাতা তার স্বগ্রামস্থ একজন দস্তখত জানা ব্যক্তি দ্বারা সনাক্ত হলে রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তা দাতার পরিচিতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

রেজিষ্ট্রী বিধিতে যদি এরূপ নিয়ম চালু হয় যে, দলিলদাতার সনাক্তকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত দলিল লেখক/এ্যাডভোকেট/রেজিষ্ট্রী কর্মকর্তার পরিচিত ব্যক্তি হতে হবে, তা'হলে জাল দলিলের সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

(ঙ) দেখা যায় ভূয়া ব্যক্তি মালিক সেজে খাস ও অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর করে নিরীহ লোককে হয়রানী করে।

এ ক্ষেত্রে যদি দাতাকে দলিলের সংগে তার ফটো দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে জাল–জালিয়াতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ১৪২ নং আদেশ মতে দাতাকে এ মর্মে হলফ করতে হয় যে, দলিলের তপসিলে কোন পরিত্যক্ত ও খাস সম্পত্তি যুক্ত করা হয়নি। রাষ্ট্রপতির এই আদেশের রুলস প্রণয়ন করে যদি তাতে মিথ্যা হলফনামা দেয়ার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় তবে এ ক্ষেত্রে জাল-জালিয়াতি কমে যাবে।

তদুপরি খাস জমি ও অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা যদি স্ব স্ব সাব-রেজিষ্ট্রারকে প্রদান করে ঐ তালিকার জমি রেজিষ্ট্রী না করার বিধান করা যায় তবে এ ক্ষেত্রেও আকাংখিত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ম্যারিজ রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন

পূর্বে ম্যারিজ রেজিষ্ট্রারগণ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন, এবং বর্তমানে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ম্যারিজ রেজিষ্ট্রারগণ কমিশনের ভিত্তিতে বিবাহ রেজিষ্ট্রী করে থাকেন। নিয়মানুসারে ম্যারিজ রেজিষ্ট্রারগণদের সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ন্যায় ম্যারিজ রেজিষ্ট্রী করে সে সকল রিপোর্ট, ইনডেক্স ইত্যাদি রেকর্ড-পত্র জেলা রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাতে হয়। আইনের শিথিলতা থাকার দরুন তারা ম্যারিজ রেজিষ্ট্রীর ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম করে। ম্যারিজ রেজিষ্ট্রী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ও আধুনিকায়নের প্রচলিত আইনের সংশোধন হওয়া দরকার এবং তাদের সুষ্ঠু তদারকীর জন্য রেজিষ্ট্রেশন পরিদপ্তরে একজন সহকারী মহা-পরিদর্শক এবং দুইজন পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন প্রসংগে কিছু আনুষঙ্গিক সুপারিশ

(ক) পূর্বের চেয়ে দলিল রেজিষ্ট্রীর সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। ফলে কাজকর্মের সংখ্যাও অনেক গুণ বেড়েছে। পূর্বে জেলা রেজিষ্ট্রী অফিস ছিল ১৯টি, বর্তমানে তা বেড়ে ৪৯টি হয়েছে। ইদানিং সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসও কিছু বেড়েছে। তাই রেজিষ্ট্রেশন পরিদপ্তরের কাজকর্ম সুষ্ঠু তদারকীর জন্য ৪টি বিভাগে চারজন উপমহা-পরিদর্শকের পদ এবং তাদের সাহায্য করার জন্য কিছু কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা দরকার। প্রতি বিভাগে একজন করে উপমহা-পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করলে একদিকে যেমন কাজের সুষ্ঠু তদারকী হবে এবং অন্যদিকে সাব-রেজিষ্ট্রার, জেলা রেজিষ্ট্রার, পরিদর্শক ও সহকারী মহা-পরিদর্শকের পদোন্নতির সুযোগ হবে এবং তদ্বারা প্রশাসন আরও গতিশীল হবে।

(খ) সাব–রেজিষ্ট্রারের পদটি বহুদিনের পুরানো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাদের পদমর্যাদা এবং বেতনক্রম সরকারের উপজেলা পর্যায়ের নূতন নূতন অনেক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নীচে। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ রেজিষ্ট্রেশন সার্ভিসকে ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এবং সাব–রেজিষ্ট্রারের পদটিকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদাসম্পন্ন করা দরকার। তদ্রূপ জেলা রেজিষ্ট্রারের পদটিও জেলার অন্যান্য অফিসারের ন্যায় সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(গ) সাব–রেজিষ্ট্রার ও জেলা রেজিষ্ট্রারের অফিসের আসবাবপত্র খুবই জীর্ণশীর্ণ ও অপ্রতুল। সাব–রেজিষ্ট্রী অফিসের মূল্যবান ভলিউম রাখার র‍্যাক ও আসবাবপত্রের আরও উন্নতি হওয়া দরকার। সরকারী ফরম ও মনিহারী দ্রব্যাদিরও নিয়মিত সরবারহ করা দরকার।

রেজিষ্ট্রেশন প্রশিক্ষণ একাডেমী

রেজিষ্ট্রেশন পরিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, নকল নবীশ ও দলিল লেখকদের রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি, কাজকর্ম ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একটা রেজিষ্ট্রেশন প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

রেজিষ্ট্রেশন পরিদপ্তর দু'শ বছরের পুরাতন একটি পরিদপ্তর। এই বিভাগের অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গতানুগতিকভাবে কাজ করে অভ্যস্ত। তাদের কার্যপদ্ধতি ও কাজের মান উন্নত করার জন্য একটা ট্রেনিং একাডেমী একান্ত দরকার।

তাছাড়া এই পরিদপ্তরের অধীনে রয়েছে প্রায় ছয় হাজার নকল নবীশ ও লক্ষাধিক দলিল লেখক। বালাম লেখার পদ্ধতি এবং দলিল লেখার ভাষা ও ধরন উন্নত করার জন্য তাদের মাঝে ট্রেনিং দেয়ার প্রয়োজন। প্রস্তাবিত ট্রেনিং একাডেমীতে তাদের মাঝে মাঝে ট্রেনিং দিলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের বালাম ও দলিলের ধরন উন্নত হবে।

এই একাডেমীতে একটি 'গবেষণা সেল' থাকলে পরিদপ্তরের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা গবেষণার মাধ্যমে সমাধান করে আধুনিক প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতিকে আরও আধুনিকায়ন করা সম্ভব হবে।

দলিল নকলের রেজিষ্ট্রার ও সূচীবহি প্রসংগে

দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রীর পর তা রেজিষ্ট্রার ভলিউমে তুলে এবং সূচীকরণ করে দ্রুত ক্রেতার হাতে দলিলটির আসল কপি পৌঁছে দেয়া এবং ভলিউম ও সূচী–রেজিষ্ট্রার স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা রেজিষ্ট্রী বিভাগের একটি বড় কৃতিত্ব।

আজকাল ফরম বিভাগ কর্তৃক রেজিষ্ট্রার ভলিউম ও সূচী-রেজিষ্ট্রার সময়মত সরবরাহ না করার দরুন অনেক সময় নকল নবীশ বেকার বসে থাকে এবং নকলের জন্য দলিলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে রেজিষ্ট্রী বিভাগ সময়মত ক্রেতার হাতে দলিল ফেরৎ দিতে পারে না এবং সাধারণ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে রেজিষ্ট্রার ভলিউম ও সূচী বহিসমূহের কাগজ, মলাট এবং বাঁধাই এতই নিম্নমানের যে খুব অল্প দিনের মধ্যেই এগুলোতে লেখা চিপসে এবং বাঁধাই খুলে যায়। তাছাড়া মলাটের দাগ লেগে উভয়দিকের ২/৩টি করে পাতার লেখা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে জনগণের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত এ সমস্ত রেকর্ডের এরূপ অবস্থা তাদের স্বার্থ নানাভাবে বিঘ্নিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই রেজিষ্ট্রেশন আইনের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই বিষয়টির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণকে সহজসাধ্য এবং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বি. জি. প্রেস হতে উন্নতমানের কাগজ, মলাট ও বাঁধাই করা রেজিষ্ট্রার ভলিউম ও সূচী-বহির নিয়মিত এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহের ব্যাপারে যথোচিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী এবং অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

জেলা রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়ে ফটোকপি মেশিন স্থাপনের সুপারিশ

প্রতিটি জেলা রেজিষ্ট্রারের অফিসের সাথে জেলা সদর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস সংযুক্ত থাকে। এ সমস্ত অফিসগুলোতে অন্যান্য অফিসের চেয়ে দলিল রেজিষ্ট্রীর সংখ্যা বেশি। বর্তমানে ক্রেতাগণ দলিল রেজিষ্ট্রীর সাথে সাথেই এর একটি সার্টিফাইড কপি নিতে চায়। সীমিত নকল নবীশগণকে একই সংগে দলিল নকলের কাজ ও ক্রেতাকে সার্টিফাইড কপি দিতে হয়। ফলে একদিকে দলিল নকলের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে, অন্যদিকে সার্টিফাইড কপি পাওয়ার জন্য জনগণ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

তাছাড়া জেলা রেজিষ্ট্রারের অফিসের সংগে জেলা সদর রেকর্ড রুম থাকে যেখানে শত বছরের ঊর্ধের নানাবিধ রেকর্ডপত্র রয়েছে। ঢাকা সদর রেকর্ড রুমে বর্তমানে ১,২৫,৫১২ খানা বালাম বহি, ১৮,৩২০ খানা সূচী রেজিষ্ট্রার, ১৩,১৮০ খানা টিপ বহি, ৬১০ খানা ক্যাটালগ রেজিষ্ট্রার একুনে ১,৫৭,৬২২ খানা রেজিষ্টার রয়েছে। বাংলাদেশের পুরাতন জেলাগুলোতে প্রায় এই সংখ্যার কাছাকাছি রেজিষ্টার রয়েছে। জনগণ প্রতিনিয়ত তাদের চাহিদা অনুসারে সদর রেকর্ডরুম হতে প্রয়োজনীয় তথ্যের আবেদন জানায়।

পুরাতন জেলা রেজিষ্ট্রারের অফিসে একটি ফটোকপি মেশিন স্থাপন করলে জনগণকে তাদের চাহিদা অনুসারে সত্ত্বর সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে একদিকে জনগণের চাহিদা পূরণ হবে এবং অন্যদিকে সরকারী আয় বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বেশীর ভাগ বকেয়া নকলের কাজ সদর সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসে জমে আছে, ফটোকপি মেশিন স্থাপনের ফলে দলিল নকলের বকেয়া কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে জনগণ স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের আসল দলিল ফেরৎ পাবেন।

দলিলে জমির মূল্য কম দেখানোর প্রবণতা রোধকরণ

রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতি মূলত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার আলোকেই প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক চাহিদা মিটাতে রেজিষ্ট্রী বিভাগ সরকারের রাজস্ব আদায়ের এক বিরাট উৎস।

রেজিষ্ট্রী পরিদপ্তরের কয়েক বৎসরের আয় নিম্নরূপ :

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে গত ১০ বছরে বিভিন্ন খাতের আয় নিম্নরূপ :

বৎসর	১০-রেজিষ্ট্রীকরণ	১% অতিঃ কর	মোট
১৯৭৯-৮০	২৭,০১,৬৭,৮৪৪/- টাকা	—	২৭,০১,৬৭,৮৪৪/- টাকা
১৯৮০-৮১	২৩,৪৫,৮৭,৮৭১/- টাকা	—	২৩,৪৫,৮৭,৮৭১/- টাকা
১৯৮১-৮২	২৭,৯২,৫৮,১৪৪/- টাকা	—	২৭,৯২,৫৮,১৪৪/- টাকা
১৯৮২-৮৩	২৮,৭৭,৮১,৪৩২/- টাকা	—	২৮,৭৭,৮১,৪৩২/- টাকা
১৯৮৩-৮৪	৩১,৮১,৯৭,৭৪৭/- টাকা	—	৩১,৮১,৯৭,৭৪৭/- টাকা
১৯৮৪-৮৫	৩৯,৯৪,৫২,১৭০/- টাকা	—	৩৯,৯৪,৫২,১৭০/- টাকা
১৯৮৫-৮৬	৪৩,৩৯,৪০,০৯৬/- টাকা	—	৪৩,৩৯,৪০,০৯৬/- টাকা
১৯৮৬-৮৭	৪৮,৮৫,৫৭,৩৬৫/- টাকা	১৮,৯৯,০১,৯৭৬/- টাকা	৬৭,৮৪,৫৯,৩৪১/- টাকা
১৯৮৭-৮৮	৩৯,৪৮,৮০,০৮৩/- টাকা	১৭,৪৩,২১,৪৫৬/- টাকা	৫৬,৯২,০১,৫৪৯/- টাকা
১৯৮৮-৮৯	৪২,৪৮,১১,২৪৬/- টাকা	১৭,১২,৩৫,৭৯৮/- টাকা	৫৯,৬০,৪৭,০৪৪/- টাকা
১৯৮৯-৯০	—	—	৭৬,২৩,৩১,১২৪/- টাকা

৮ম ষ্ট্যাম্প নগদ আদায়

১৯৮২-৮৩	৩১,১২,৭১,৫৭০/- টাকা
১৯৮৩-৮৪	৩১,০৮,৮১,১২৭/- টাকা
১৯৮৪-৮৫	১৭,০২,৩৬,৯১৮/- টাকা
১৯৮৫-৮৬	১৯,৪৩,০৫,৬৮৪/- টাকা
১৯৮৬-৮৭	১৪,৮১,৭০,৪৬৮/- টাকা
১৯৮৭-৮৮	৯,৮০,০৬,৩৪২/- টাকা
১৯৮৮-৮৯	৭,৮৯,২৯,০২৩/- টাকা

যমুনা সারচার্জ

১৯৮৪-৮৫	১,২২,৯৫,৯৬৫/- টাকা
১৯৮৫-৮৬	১,৮৩,০৪,৬৬৫/- টাকা
১৯৮৬-৮৭	১,৫৬,৭১,৬৫৫/- টাকা
১৯৮৭-৮৮	১,৫৬,৭১,৬৫৫/- টাকা
১৯৮৮-৮৯	১,৪২,২৪,৩৭০/- টাকা

১% এল, জি, কর বাবদ আয়

বৎসর	১০-রেজিস্ট্রীকরণ	১% অতিঃ কর	মোট
১৯৮১-৮২			১১,০৮,১৬,৪৭০/- টাকা
১৯৮২-৮৩			১২,০৭,৭৬,৫০০/- টাকা
১৯৮৩-৮৪			১৩,৬৩,৭৭,০১৫/- টাকা
১৯৮৪-৮৫			১২,৬৫,০০,৯৫৬/- টাকা
১৯৮৫-৮৬			১৬,৮৪,৪৪,৯৭১/- টাকা
১৯৮৬-৮৭			১৮,৬২,৭৭,০৪৩/- টাকা
১৯৮৭-৮৮			১৫,৭২,৯৭,৭০৪/- টাকা
১৯৮৮-৮৯			১৭,৫০,৯৪,৭৪২/- টাকা

ইদানিং দলিলে জমির মূল্য কম দেখিয়ে জমি রেজিস্ট্রী করবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এটি এক বিরাট হুমকী। এই অশুভ প্রবণতা রোধ না করলে আমাদের জাতীয় আয়ে বিরাট ঘাটতি দেখা দিবে।

জমি বিক্রির সময় দাতাকে ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪২ অনুসারে এ মর্মে হলফ করতে হয় যে, প্রস্তাবিত সম্পত্তি নির্ভুলভাবে দলিলে বর্ণিত হয়েছে এবং এর মূল্য কম দেখানো হয়নি। রাষ্ট্রপতির এই আদেশের কোন রুলস করা হয়নি। এই মর্মে যদি উক্ত আদেশের রুলস করা যায় যে, রাষ্ট্রপতির উক্ত আদেশ ভংগ করলে হস্তান্তর দলিল বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জমি সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হবে। তাহলে এ রুলস অনুসারে দৃষ্টান্তমূলকভাবে নিম্নমূল্য দেখানোর জন্য কিছু দলিলের জমি সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হলে দলিলে কম মূল্য দেখানোর প্রবণতা কমে যাবে।

বর্তমানে আইন প্রচলিত আছে যে, যদি পক্ষগণ ষ্ট্যাম্প এ্যাক্টের ২৭ ধারা অনুসারে ষ্ট্যাম্প ফি ফাঁকি দেয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখান তবে এ ক্ষেত্রে সাব-রেজিষ্ট্রার মূল্য নির্ধারণের জন্য ডেপুটি কমিশনারের কাছে ঘাটতি ষ্ট্যাম্প শুল্ক আদায়ের জন্য লিখতে পারে এবং ডেপুটি কমিশনার তদন্তপূর্বক যদি দেখেন যে দলিলে মূল্য কম দেখান হয়েছে তবে মূল্য নির্ধারণপূর্বক তার বাকী ষ্ট্যাম্প আদায়ের জন্য সাব-রেজিষ্ট্রারকে নির্দেশ দিবেন।

উপসংহার

১৭৮১ সন হতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আদেশ ও অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে ১৯০৮ সনে রেজিষ্ট্রেশন আইন পূর্ণাংগ রূপ লাভ করে। তারপর বহুকাল গত হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিত সাফল্য এসেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, জীবনবোধ ও মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন হয়নি এই পরিদপ্তরের। শতাব্দীকালের পুরাতন

রেজিষ্ট্রেশন আইন ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া স্বাভাবতই পশ্চাদপদ রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিক যুগের চাহিদা মিটাতে পাচ্ছে না। পদ্ধতি অধিকতর গণমুখী ও আধুনিকায়ন হোক এটা সকলেরই কাম্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রেজিষ্ট্রেশন আইন রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়নের কিছু সুচিন্তিত সুপারিশ রাখা হয়েছে। আশা করা যায় এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে রেজিষ্ট্রেশন পরিদপ্তরে গতি সঞ্চারিত হবে এবং জনগণ এর সুফল ভোগ করবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রহমান, গাজী শামসুর : রেজিষ্ট্রেশন আইনের ভাষ্য।

২। মুল্লা, ডি এফ : ভারতীয় রেজিষ্ট্রেশন আইন।

৩। মুখোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ : দলিল লেখন ও রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি।

৪। Row's Sanjiva : Registration Act, 7th Edition.

৫। The Stamp Act, 1899.

৬। The Bengal Registration Manual, 1982.

৭। The Bangladesh Registration Manual, 1983.

৮। রেজিষ্ট্রী পরিদপ্তর : রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর পদ্ধতি।

৯। মুখপত্র, বাংলাদেশ রেজিষ্ট্রেশন সার্ভিস এসোসিয়েশন : খিদমত।

১০। ভূমি মন্ত্রণালয় : অগ্রগতির পাঁচ বছর, ১৯৮২–১৯৮৭ ইং।

১১। অর্থ আইন, ১৯৯০ ইং।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

বাংলাদেশের দারিদ্র : অতীত ও বর্তমান সমস্যা ও সমাধান

হীরালাল বালা*

ভূমিকা

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, প্রাচীন (খ্রী: পূ: ৩২৬ অব্দ–১২০৩ খ্রী:) ও মধ্যযুগে (১২০৩–১৭৫৭) বাংলাদেশ ধন–ধান্যে–পুষ্পেভরা একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার দেশ ছিল। তৎকালে এ দেশ কৃষি–শিল্প, ব্যবসা–বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। এ সকল কারণে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার এতটা উন্নতি হয়েছিল যে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল সোনার বাংলা, রূপসী বাংলা ও প্রাচুর্যের বাংলা। ঐতিহাসিকদের এই অভিমত তৎকালে প্রাপ্ত লেখমালা, কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও দলিল–দস্তাবেজ প্রভৃতি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সকল উপাদানে অতিরঞ্জন, কল্পনা ও ভাবাবেগের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। সে জন্য সত্যিকার ইতিহাস নির্মাণে অনেক সময় অসুবিধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস নির্মিত হয়েছে এ সকল উপাদানকে নির্ভর ও আশ্রয় করে। অবশ্য এ সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার–বিশ্লেষণ করে যারা ইতিহাস রচনা করেছেন তাদের গ্রন্থে বাংলার যথার্থ ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও সমৃদ্ধি একটি অতিকথন

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশকে সোনার বাংলা এবং প্রাচুর্যের বাংলায় অভিহিত করার পেছনে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, এ সময়ে বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা ভোগ করেছে। দ্বিতীয়ত, তখন দেশটি ছিল 'প্রাচুর্য ও সস্তার দেশ'। তৃতীয়ত, এ অর্থনীতির সুবিধেভোগীরা কখনোই দারিদ্রের শিকার হয়নি। চতুর্থত, সমসাময়িক অন্যান্য সমাজের তুলনায় এ সময়ে বাঙ্গালী সমাজ বেশী সমৃদ্ধ ছিল।[১]

উপরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ও প্রাচুর্যের সপক্ষে যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয়েছে তা সকল ঐতিহাসিকের অভিমত বা অভিপ্রেত নয়। 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) প্রণেতা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার–এর নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। ডঃ রায় যদিও তাঁর গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার সুখ ও সমৃদ্ধির চিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এঁকেছেন কিন্তু তিনি এও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, সমাজের নিম্নস্তরে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ সেকালেও দারিদ্র প্রপীড়িত ছিল। ডঃ মজুমদার তার 'বাংলার ইতিহাস' (আধুনিক যুগ)–এ একস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানের তুলনায় স্বল্পমূল্য দেখে কেউ যদি মনে করেন যে, শত বছর পূর্বে

---

* পরিচালক, ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা –১৩৪৩।

১। আকবর আলী খান : **সোনার বাংলা : মিথ ও বাস্তব**, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪–১৯৭১),এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,ঢাকা, ১৯৯২,পৃ:৫৮৫।

বাংলায় রামরাজ্য ছিল, লোকে মহাসুখে জীবন ধারণ করত, তাহলে তিনি বিষম ভুল করবেন। কারণ তখন শ্রমের মূল্যও ছিল অনেক কম। বলাবাহুল্য ডঃ মজুমদার বৃটিশ আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলার দাসপ্রথা আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ডঃ আবদুর রহিম বলেছেন যে, দারিদ্রের কারণে সে সময় (মধ্যযুগ) ছেলেদের খোজা করে বিক্রয় করা হোত।[২]

বাংলার অর্থনীতি সব সময়ই কৃষি নির্ভর ছিল। কৃষি নির্ভর অর্থনীতি শিল্প নির্ভর অর্থনীতি অপেক্ষা যে অনুন্নত তা আজ দিবালোকের মত সত্য। কি কি কারণে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত তাও আজ নিরূপিত। পৃথিবীর কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সেখানে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, মজুরির নিম্নহার, বেকারত্ব ও ক্রয় ক্ষমতার অনুপস্থিতি, সম্পদ সঞ্চালনে ও মূলধন গঠনে ধীরগতি প্রভৃতি পশ্চাৎপদ অর্থনীতির ও সমাজের উপসর্গ বিদ্যমান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে কার্ল মার্কস এ কথা বলেছিলেন বহুপূর্বে। তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হল, ভারতীয় জীবন "অশালীন, স্থবির ও তার জনসংখ্যা বর্ধনশীল"। গ্রামীণ সমাজকে তিনি বলেন, ক্ষুদ্র, আধা-বর্বর ও আধা-সভ্য।

মেক্সিম গোর্কির ভাষায়, কৃষকরা সর্বত্র সমান। যে কোন মতবাদে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদগণ প্রায় একমত যে, কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমের মূল্য যথেষ্ট নয়, উৎপাদন স্থিতিশীল নয়, উৎপাদিত ফসল সমভাবে বন্টিত হয় না, ভূমির মালিকানা স্বত্ব সবার সমান নয়, উৎপাদিত ফসল ন্যায্য মূল্য পায় না, বেকারত্ব থাকে, আয় বন্টনে বৈষম্য বিরাজ করে।

এ সব স্বীকার করে নিলে অবশ্যই মেনে নিতে হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় দারিদ্র ছিল, দারিদ্রের কারণও ছিল। এ দারিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও পেশাজীবী প্রভৃতি সকল স্তরের ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছিল। শ্রমজীবী ও পেশাজীবীরা যে দারিদ্রের শিকার হয়েছিল এরূপ নজির প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে এখানে-সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। অনেকের মতে বাংলাদেশ শুধু কৃষি নির্ভর ছিল না, সেখানে শিল্পদ্রব্যেরও যথেষ্ট উৎপাদন ছিল। বাংলাদেশের রেশম ও সুতী বস্ত্র, চিনি, লবণ, পান, সুপারি, গুড়, নানা প্রকার মশলা, হীরে-মুক্তা প্রভৃতি অনেক কিছুই যথেষ্ট উৎপাদিত হতো এবং বিদেশেও তা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হোত। সে সুবাদে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে প্রচুর সোনা-রূপা ও টাকা-পয়সা আসতো। এ ব্যবসা-বাণিজ্যে এদেশের বহু লোক ধনীও বনে গিয়েছিল। সত্য বটে, বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল, শিল্পোৎপাদন ছিল, বিদেশ থেকে সোনা-রূপা, টাকা-পয়সার আমদানীও ছিল। কিন্ত তা সমাজের সকল স্তরের ও শ্রেণীর মানুষের নিকট কোনদিনই সমভাবে পৌঁছেনি। শ্রমিক ও মজুর সবদিনই বঞ্চিত হয়েছে।

২। বাংলাদেশের প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা বিস্তারিত দেখুন গ্রন্থপঞ্জির ১ নং ক্রমিকের পৃ:১৫২-১৯৯, মধ্য ও আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থাদেখুন ৩ নং ক্রমিকের পৃ:৩৫৭-৩৯০, ৪ ও ৫ নং ক্রমিকের পৃ : ৪৩৭-৪৬৯, পৃ : ৪৮১-৫১৯, ৭নং ক্রমিকের পৃ: ২১৬-২২৯ এবং ৮ নং ক্রমিকের সমগ্র পুস্তকখানি।

এরপরও যদি ধরে নেয়া হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা ভোগ করেছে এবং এ ধারা ছিল নিরন্তর ও নিরবধি ; তাহলে এও ধরে নিতে হয় যে, বাংলাদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি, মানুষ ভাতের অভাব, বস্ত্রের অভাব ও বাসস্থানের অভাবের সম্মুখীন হয়নি। অথচ এ যুগের ইতিহাস কম করে হলেও চারটি দুর্ভিক্ষের বার্তা বয়ে এনেছে। প্রথম দুর্ভিক্ষটি সংঘটিত হয়েছিল পুণ্ড্রনগরে (বর্তমান বগুড়া) খ্রী: পূ: তৃতীয়/দ্বিতীয় শতকে। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল গৌড়ের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে ৯ম শতকে, তৃতীয়টি ঘটেছিল নবদ্বীপ বা তৎসংলগ্ন এলাকায় যার উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' (১৫৩৮) কাব্যে পাওয়া যায়, চতুর্থ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৬৬১-৬৩ সালে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দুর্ভিক্ষ দু'টি ছিল মনুষ্য সৃষ্ট। প্রথমটি প্রাকৃতিক কারণে ঘটেছিল। শেষোক্ত দুর্ভিক্ষে খাদ্য-শস্যের মূল্য বাড়ার কারণ ছিল খাদ্য-শস্যের অপর্যাপ্ততা নয় বরং নানা বিপদসংকুল পরিবেশ ও মালামাল পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নিত হবার কারণে। রুটির চেয়ে তখন জীবন সস্তা হয়ে গিয়েছিল। রুটি পাওয়াই যেত না।[৩]

মুদ্রা ব্যবস্থা

প্রাচীন যুগে গুপ্ত আমলে ও তার পরবর্তীকালে বাংলাদেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেন ও পাল আমলে স্বর্ণমুদ্রা প্রথমে ওজনে কম ও নকল হয় এবং পরে তাও উধাও হয়। এ সময়ে কড়িই একমাত্র কেনা-বেচার মাধ্যম ছিল। এমনকি সারা মধ্যযুগে কড়ি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যদিও এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা এদেশে এসেছিল। কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ির এত ব্যাপক ব্যবহার উন্নত অর্থনীতির দ্যোতক নয়।

সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী

দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতকে রচিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ৪১টি বর্ণের/পেশার মানুষের উল্লেখ আছে।[৪] এ সকল পেশাজীবী মানুষের অধিকাংশের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৫৩৮ সালে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'। সুতরাং বলা চলে যে, বাংলাদেশের এই বর্ণ/পেশা ভিত্তিক সমাজ বহুদিন চলে আসছিল। শ্রেণী/পেশা ভিত্তিক সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ যে সচ্ছল ছিল না তা আজকের দিনে ঐ শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়।

৩। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, **দি হিস্টরি অব বেঙ্গল,** খণ্ড ২ (পাটনা, ১৯৭৩), পৃ : ৩৪৪।

৪। নীহার রঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, কলিকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ : ২৯১-৩০৩।

দাস প্রথা

প্রাচীনকাল হতে এদেশে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। এ প্রথা মধ্যযুগে ও বৃটিশ আমলের প্রথমার্ধে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ডঃ আকবর আলী খান ১৬৯৫–১৭৫৪ সালের মানুষ বিক্রির কিছু দলিল থেকে ৬ জন দাস-দাসী বিক্রির একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন।[৫] এ সব দাস-দাসী বিক্রি হয়েছে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টজনিত কারণে। মন্টেগোমারী মার্টিন ১৮৬২ সালে দাস-দাসী বিক্রয়ের যে বিবরণ দেন তা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে প্রদত্ত হল [৬]:

স্থান	দাস-দাসীর সংখ্যা
রংপুর	৫,৩৬,১৪০
রাজশাহী	৭,৬৬,৩৪১
ঢাকা, জামালপুর	২,৭৫,১৯০
চট্টগ্রাম	১,৭৫,২০০
সিলেট	৩,৬১,২৪০
ময়মনসিংহ	৩,৬৩,৬৭৭

উপরের বর্ণনা থেকে বাংলাদেশের দাস প্রথার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে সমাজে দারিদ্র কতটা ব্যাপক আকারে বিদ্যমান ছিল। এরপর বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস কম-বেশী সকল শিক্ষিত মানুষের জানা। কিভাবে ইংরেজ এ দেশের হস্তশিল্প, কারুশিল্প ও তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করেছে, এ দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা বিলেতে পাচার করেছে, এ দেশের মাটিতে বিলেতি পণ্যের বাজার সৃষ্টি করেছে ; এ দেশের অর্থে বিলেতে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে ; সে ইতিহাস অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইংরেজের বাণিজ্য, শুল্ক ও রাজস্ব নীতির ফলে এদেশের কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী মার খেয়েছে, দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। জনগণ অর্থকষ্টে ও অন্নকষ্টে পড়েছে। বৃটিশ আমলে বাংলাদেশে যে সকল শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছিল তার অধিকাংশ পড়েছিল কলকাতার আশে-পাশে। বর্তমান বাংলাদেশের ভাগে পড়েছিল ৩টি চিনির কল, ৫টি কাপড়ের কল, ১০টি জুট বেইলিং প্রেস এবং একটি সিমেন্ট কারখানা। অর্থাৎ এ অঞ্চলটি তখন পুরোপুরি কৃষি নির্ভর ছিল।

পাকিস্তান আমলের বঞ্চনা ইংরেজের বঞ্চনার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এ বঞ্চনা ছিল অর্থনৈতিক, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক, প্রতিরক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে। এ দেশের রাজস্ব ও বাণিজ্য থেকে আহৃত অর্থের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় হয়। ফলে বাংলাদেশ থাকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।* প্রাপ্ত

* এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন ঃ গাজীউল হক প্রণীত "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", পুথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ২৪–৩৩ পৃষ্ঠা।

৫। আকবর আলী খান : সোনার বাংলা : মিথ ও বাস্তব, প্রাগুক্ত পৃ: ৬০১।

৬। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন D. R. Banarji, *Slavery in British India,* Bombay, Kitabmahal. 1933.

বৈদেশিক সাহায্যের বেশীর ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়। ফলে এই সীমাহীন শোষণ ও বঞ্চনার ফলে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলাদেশে দারিদ্রের বিশ্লেষণ

পূর্বের আলোচনায় বাংলাদেশের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় সে সময়কালে বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে কিছু ধারণা ও তথ্য পাওয়া যায়। যতদূর জানা ও বোঝা যায় তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে সমাজে দরিদ্র মানুষ ছিল, দেশের অর্থনীতি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। সেকালেও শোষণ ও বঞ্চনা ছিল। সমাজের একটি অংশ চরম দারিদ্রের শিকার হয়েছিল।

বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এ সম্পর্কিত গবেষণা ও জরিপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া দরকার। ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অভ্ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ (বি আই ডি এস) এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা/জরিপ পরিচালনা করেছে। বিশ্ব ব্যাংক, বিবিএস, আইএলও, ফাও, আই এম এফ প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গবেষণা/জরিপ থেকে এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। ইদানীং দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। এ সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

জনসাধারণের ওপর গবেষণা/জরিপে বাংলাদেশের দারিদ্রের চিত্র সারণি ১-৭ এ-প্রদর্শিত হল :

সারণি - ১

বাংলাদেশের দারিদ্রের চিত্র

বছর	দরিদ্র জনগণের শতকরা হার	
	ফাও-এর সুপারিশ অনুযায়ী ২৩৩২ কি: ক্যা: (ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা)	আহমদ ও হোসেন-এর সুপারিশ মতে ২০৮৭ কি: ক্যা: (ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা)
১৯৬৩-৬৪	৭৫%	৫২%
১৯৭৭-৭৮	৪৮.৬%	৬৭.৯%

উপরের তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৬৩-৬৪ সালের দারিদ্র অবস্থা ১৯৭৭-৭৮ সালে অনেক হ্রাস পায়। কিন্তু আহমদ ও হোসেনের জরিপ অনুসারে ১৯৬৩-৬৪ সালের ৫২%

দারিদ্র বেড়ে ১৯৭৭-৭৮ সালে ৬৭.৯%তে উপনীত হয়। দারিদ্র সম্পর্কে এখানে দু'টি ভিন্নধর্মী চিত্র পাওয়া যায়। একদিকে দারিদ্র হ্রাসের ও অন্যদিকে দারিদ্র বৃদ্ধির প্রবণতা।

সারণি – ২
দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি

বছর (আর্থিক)		অনপেক্ষ দারিদ্র ২২০০ কি: ক্যা:/ব্যক্তি/দিন		চরম দারিদ্র ১৮০০ কি : ক্যা : ব্যক্তি/দিন	
		শহর	পল্লী	শহর	পল্লী
ক. দারিদ্র রেখার নিম্ন আয়ের জনসংখ্যার অনুপাত :					
অর্থ বছর	'৭৪	৬২.৫০	৬৫.২৭	৪৬.৮২	৪৯.৬৭
অর্থ বছর	'৮২	৫০.৬৬	৭৯.১২	৩৫.৪৫	৬৬.৪৪
অর্থ বছর	'৮৪	৩৯.৫২	৪৯.৮১	২৪.৮৩	৩২.০২
অর্থ বছর	'৮৬	২৯.১১	৪৭.০৮	১৬.০৫	২৮.৩৬
খ. দরিদ্র মানুষের সংখ্যা (মিলিয়ন) :					
অর্থ বছর	'৭৪	৩.৯	৪১.৩৮	২.৮৮	২৮.৬৭
অর্থ বছর	'৮২	৬.০১	৫৭.৯২	৪.২০	৪৮.৬৩
অর্থ বছর	'৮৪	৪.২৬	৪১.০৫	২.৬৮	২৬.৩৯
অর্থ বছর	'৮৬	৩.৬৬	৪১.০১	২.০২	২৪.৭১

সারণি – ৩
দারিদ্র সীমা ও দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি

বছর	দারিদ্র সীমারেখা (টাকার অঙ্কে বার্ষিক মাথাপিছু ন্যূনতম ব্যয়)		দারিদ্র সীমার নিম্নের জনসংখ্যার শতকরা হার	
	শহর	পল্লী	শহর	পল্লী
১৯৭৩-৭৪	১,৪৩৮	১,১০০	৭৬.৪	৭৭.৩
১৯৮১-৮২	৩,২৫৩	২,৬০২	৫৫.৬	৭৭.৮
১৯৮৩-৮৪	৩,৯৬০	৩,১৬৮	৪৮.৬	৫২.১
১৯৮৫-৮৬	৪,৯৪১	৩,৯৫৩	৩৯.২	৪৯.৯

সূত্র : মাহবুব হোসেন, মে, ১৯৮৮।

সারণি – ৪
বিশ্ব ব্যাংকের দারিদ্র সমীক্ষা

অর্থ বছর	দারিদ্র সীমা – ১ ২১২২ কি: ক্যা:/ব্যক্তি/দিন		দারিদ্র সীমা – ২ ১৮০৫ কি : ক্যা : ব্যক্তি/দিন	
	শহর	পল্লী	শহর	পল্লী
অর্থ বছর '৭৪	৮১.৪	৮২.৯	২৮.৬	৪৪.৩
অর্থ বছর '৮২ (ক)	৬৯.০	৯০.০	৩০.৭	৬৬.০০
অর্থ বছর '৮২ (খ)	৬৬.০	৭৩.৮	৩০.৭	৫২.২

নোট : ক. ১৯৭৩–৭৪ সালের খানা ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত ভোগের ধারা ভিত্তি করে;
খ. ১৯৮১–৮২ সালের খানা ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত ভোগের ধারা ভিত্তি করে।

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৮৭।

সারণি – ৫
জাতীয় আয় পরিমাপ ও খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত আয় পরিমাপের তুলনা

	জিএনপি কারেন্ট ফ্যাক্টর কষ্ট (মিলিয়ন টাকা)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জাতীয় আয় পরিমাপ থেকে মাথাপিছু আয় (টা:/মাস)	খানা ব্যয় জরিপ থেকে প্রাপ্ত মাথাপিছু আয় (টা:/মাস)	৩ এর শতাংশ হিসেবে ৪
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
অর্থ বছর '৭৪	৬৬৪৮২	৭৬.৪০	৮৭০	৯৭৭	১১২
অর্থ বছর '৭৭	১০০২৯৯	৮১.৮৫	১২২৫	১৪৮৩	১২১
অর্থ বছর '৮২	২৫৭০৯৭	৯০.৯৩	২৮২৭	২৫২০	৮৯
অর্থ বছর '৮৪	৩৪৩২২২	৯৫.২০	৩৬৩২	৪০২৯	১১২
অর্থ বছর '৮৬	৪৪৮১৫০	৯৯.৫৫	৪৫৫৯	৫২৫৯	১১৭

সারণি – ৬

আয় বন্টনে জিনিসূচক (১৯৭৩-৮৬)

	শহর		পল্লী	
	মাথাপিছু আয়	খানা প্রতি আয়	মাথাপিছু আয়	খানা প্রতি আয়
অর্থ বছর '৭৩–৭৪	০.৩২৩	০.৩৮৮	০.২৯৬	০.৩৯২
অর্থ বছর '৮১–৮২	০.৩৪৪	০.৪১৭	০.২৭১	০.৩৬০
অর্থ বছর '৮৩–৮৪	০.২৯১	০.৩৬৪	০.২৭১	০.৩৪৪
অর্থ বছর '৮৫–৮৬	০.৩১৫	০.৩৬৪	০.২৯২	০.৩৬৮

সূত্র : মাহবুব হোসেন (মে, ১৯৮৮)।

সারণি – ৭

বিভিন্ন বিভাজিত শ্রেণীর খানা প্রতি প্রকৃত আয় ১৯৬৩-৬৪ বার্ষিক টাকা মূল্যে

বিভাজিত শ্রেণী	১৯৭৩–৭৪	১৯৭৬–৭৭	১৯৮১–৮২	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৫–৮৬
পল্লী					
উর্ধ্বের ৫ শতাংশ	৪২৯৮	৭০৮৩	৫৪৭২	৭৩৩০	৯৬২৬
উর্ধ্বের ১০ শতাংশ	৩৪১৯	৪৭১৫	৪২৫৪	৫৪৫৫	৬৮৮২
উর্ধ্বের ১৫ শতাংশ	২৯৭৯	৩৮২৮	৩৬২৬	৪৬২০	৫৬০৪
নিম্নের ৮৫ শতাংশ	১০০৩	৯১০	১১৯০	১৪৪৬	১৬৩২
নিম্নের ৪০ শতাংশ	৬৩৪	—	৮২৫	৮৯২	১০৮৫
শহর					
উর্ধ্বের ৫ শতাংশ	৮৩০৮	১৬৪৬৫	১২৩৩৪	৭৩৫৪	১১৫২১
উর্ধ্বের ১০ শতাংশ	৬৩২১	১০৯৯০	৯৭৩১	৬৪৪১	১০২১৯
উর্ধ্বের ১৫ শতাংশ	৫৬৩৮	৮৩৭২	৮১৬৬	৬১০২	৯০২২
উর্ধ্বের ৮৫ শতাংশ	১৫৯০	১৩৩৯	১৯৬৮	২০২৮	২৬৪৪
নিম্নের ৪০ শতাংশ	৯৫৪	—	১১৫৭	১২২৮	১৬৮১

সূত্র : আতিক রহমান এবং তৃণা হক (মে, ১৯৮৮)।

সারণি ২, ৩ ও ৪ পর্যালোচনান্তে দারিদ্র অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রে দেখা যায়, ১৯৮১–৮২ সালে ১৯৭৪ সালের পর্যায় থেকে গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা

অধিক। তবে ১৯৮২ সালের পর থেকে গ্রামীণ ও শহরের দারিদ্র হ্রাসের বিষয়টি প্রকটভাবে নজরে পড়ে যা ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা সম্পর্কে এ সকল তথ্য যদি যথার্থ হয়, তাহলে স্বভাবত প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, এ সময়কালে এমন কি ঘটেছিল যেজন্য দারিদ্র হ্রাস পেল ; নাকি তথ্য সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কারণে দারিদ্র হ্রাসের চিত্রটি এভাবে ফুটে উঠেছে। ধারণা করা হয় যে, ১৯৮৪ সালে খানা ব্যয় জরিপ পদ্ধতির যে পরিবর্তন করা হয় সে জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণে এমনটি ঘটেছে। উপরন্তু জাতীয় আয় পরিমাপের ফলাফল এবং খানা ব্যয় জরিপ থেকে প্রাপ্ত মাথাপিছু আয়ের ফলাফলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (৫ নং সারণি)। বিশেষ করে ১৯৮২ সালের খানা ব্যয় জরিপ থেকে প্রাপ্ত মাথাপিছু আয়ের নিম্নহার এবং অন্যান্য বছরের উচ্চহারের বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য। এ পার্থক্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক দারিদ্র পরিস্থিতি হ্রাসের হিসেব থেকে যদি কিছু কাট-ছাঁট করা হয় তারপরও যে অবস্থা দাঁড়ায় তাতে সামান্য হলেও দারিদ্র হ্রাসের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অন্যমতে সত্তরের দশকে বাংলাদেশে দারিদ্রের আশংকাজনক অবনতি ঘটে, আশির দশকে কিছুটা উন্নতি হয়, কিন্তু তারপর থেকে দারিদ্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি গবেষণামতে বাংলাদেশে অনপেক্ষ দরিদ্রের সংখ্যা ১৯৬৩–৬৪ সালে ৪০.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৭৫ সালে ৬১.৮ শতাংশ হয়।[৭] এ তথ্য সমর্থিত হয় কিউ, কে, আহমদ এবং এম, হোসেন (১৯৮৫) এর গবেষণায় যেখানে তাঁরা বলেন যে, ১৯৭৭–৭৮ সালে অনপেক্ষ দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ৫২ শতাংশ।[৮] ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ৪৪ মিলিয়ন (৫১ শতাংশ) এবং শহরাঞ্চলে ৭ মিলিয়ন (৫৬ শতাংশ) মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেছে। ১৯৮৮–৮৯ সালে গ্রামীণ খানার ৪৩ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত ছিল। ১৯৮৯–৯০ সালে খানা আয় তথ্য অনুসারে ৫৫ শতাংশ মানুষ দরিদ্র ছিল।[৯]

আতিক রহমান এবং তৃণা হকে'র (১৯৮৮) মতে ১৯৭৩–৭৪ থকে ১৯৮১–৮২ সালে দারিদ্র বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক ও বিবিএস সূত্রে এ সময়ে দারিদ্র হ্রাসের কথা উল্লেখ করা হয়। আতিক রহমান ও তৃণা হকের (১৯৮৮) সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ১৯৮১–৮২ সালে খানা আয় অত্যন্ত নিম্নহার নির্ণয়ের কারণেই গৃহীত হয়। কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক ও বিবিএস–এর অনুসৃত পদ্ধতি ১৯৮১–৮২ সালে খানা ব্যয় জরিপ পদ্ধতির সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত নয় যা তাদের ফলাফলকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে। এ জন্য এ দু'টি সূত্রের

৭। For Details see
A. R. Khan (1977), *Poverty and Inequality in Rural Bangladesh, Poverty and Landlessness in Rural Asia,* ILO, Geneva.

৮। For further detail see
Mustafa A. Rahman, *et. al, Grameen Bank in Employment Creation & Poverty Alleviation,* BPATC, Savar, Dhaka, August, 1993.

৯। See Executive summary (page II) of Hossain Zillur Rahman ed. (1992) : *Analysis of Poverty Trends Project, Rethinking Rural Poverty : A Case for Bangladesh,* BIDS, Dhaka.

তথ্যের ভিত্তিতে দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা সম্পর্কে মতামতের গ্রহণযোগ্যতা অধিক। কিন্তু তাদের পদ্ধতিও আয় জরিপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্ত নয়।

এমতাবস্থায়, কোন বিশেষ অর্থ বছরে বা সময়ে দারিদ্র বৃদ্ধি পেল না হ্রাস পেল তা নির্ণয় করা আসলে কঠিন কাজ। তবুও উপরের বিশ্লেষণে যা নির্দেশ করে তাহল সত্তরের দশকে দরিদ্র অবস্থার অবনতি ঘটে, কিন্তু আশির দশকে দারিদ্রের অবনতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীত নয়। ওসমানী (১৯৯০) মনে করেন, এ সময় মাঝারি ধরনের দারিদ্র কমলেও সে সঙ্গে চরম দারিদ্র বেড়েছে। বছর নির্বাচন, নির্দিষ্ট অনুসৃত পদ্ধতি এবং সংগৃহীত তথ্যপঞ্জি প্রভৃতির গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা এ ধরনের মূল্যায়নের একটা সবল দিক বলে এখানে দাবী করা হয়। এর সমর্থনে প্রথমে তাঁরা (ওসমানী ১৯৯০) যা বলেন তাহল ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে বার্ষিক মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২ শতাংশ হারে কিন্তু এর বিপরীতে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়ে যৎসামান্য অর্থাৎ মাত্র ০.২ শতাংশ। এ অবস্থা খাদ্যের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে বিরাট অসমতা প্রমাণ করে।[১০]

এ অসমতা আয় বন্টনের বিরাট বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যার অর্থ হচ্ছে বাড়তি আয় শুধু অত্যন্ত ধনীদেরই ধন বৃদ্ধি করেছে যাদের বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না। অথবা এ সময়ে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বেশী বেড়েছে। কিন্তু বিবেচ্য সময়ে খাদ্য-শস্যের আপেক্ষিক মূল্য বাড়েনি। যেমনটি বেড়েছিল স্বাধীনতার পূর্ববর্তী দশকে। স্বাধীনতা উত্তরকালে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।[১১] এতে অনুমিত হয় আয় বন্টনে দারুণ বিপর্যয়ের ফলে খাদ্য-শস্যের চাহিদা চেপে রেখেছিল। যদিও খানা ব্যয় জরিপ তথ্য আয় বন্টনের বিশেষ বৈষম্য নির্দেশ করে না ; কিন্তু সামষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্র থেকে ধরা পড়ে যে এ বর্দ্ধিত আয় কেবল ধনীদের সম্পদ বর্ধনে যোগ হয়েছে যাদের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অনেক আগেই মিটে গেছে।[১২] এটাও অনেকটা সত্য যে, এসব খানার ছদ্ম আবরণে আয়ের চেহারাটা ঢাকা পড়ে তজ্জন্য তাদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা সহজ হয় না। খানা আয়-ব্যয় জরিপের প্রাপ্ত চিত্র যাইহোক এটা অনুমান করা যায় যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে আয় বৃদ্ধি গরিবের জন্য হয়নি ; বরং তা তেলে মাথায় তেল দেয়ার সামিল হয়েছে।[১৩]

আসলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামগ্রিক দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হয়নি। দারিদ্রের সামগ্রিক উন্নতি হলে মাথাপিছু খাদ্য-চাহিদা এবং

১০। S. R. Osmani, Notes on Some Recent Estimates of Rural Poverty in Bangladesh, in *Special Issue on Poverty in Bangladesh,* BIDS, Vol. XVIII, Number 3, September 1990, p. 86.

১১। ঐ পৃ: ৮৬।

১২। ঐ পৃ: ৮৬।

১৩। ঐ পৃ: ৮৬।

খাদ্যশস্যের আপেক্ষিক মূল্যও বৃদ্ধি পেত। কিন্তু তা ঘটেনি। এরপরও যদি অনুমান করা হয় যে, কেউ কেউ দারিদ্রসীমা অতিক্রম করেছে, সেটিও তারা করেছে দরিদ্রদের দরিদ্রতর করে।[১৪]

১৯৮৪–৮৫ সালে মুশাররফ হোসেন ও অন্যান্যরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬টি গ্রামে যে জরিপ চালান তাতে তাঁরা দেখতে পান যে, ঐ সময়ে পল্লীর দরিদ্র জনগণ গড়ে প্রতিদিন ১৪ আউন্সের চেয়ে কম খাদ্যশস্য গ্রহণ করে। যদিও সরকারী হিসেবে সারা বাংলাদেশে এ পরিমাণ ছিল ১৬ আউন্স। শহরবাসী গ্রামবাসীর চেয়ে বেশী পরিমাণে শাক-শব্জী, ডাল-মাছ খায়। গ্রামের লোক শারীরিক ও দৈহিক পরিশ্রম বেশী করে। এজন্যে তাদের বেশী খাওয়ার প্রয়োজন হয়। এদিকে শহরের মানুষের খাদ্যশস্য কম লাগে। সমগ্র দেশের মানুষের চেয়ে গ্রামের মানুষের গড়ে কম খাদ্যশস্য গ্রহণ করাটাই দারিদ্রের সবচেয়ে বড় নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[১৫]

আয় বন্টনের বৈষম্যের মাত্রাও সমাজে দারিদ্রের উপস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। জাতীয় আয় বন্টন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'জিনি' সূচক দ্বারা চিহ্নিত হয়। উক্ত জিনি সূচক অনুসারে মাথাপিছু ও খানা প্রতি আয় বন্টনের চিত্রে মনে হয় যে, ১৯৮৩–৮৪ সালে পল্লীর জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বন্টনে ১৯৭৩–৭৪ সালের চেয়ে উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু ১৯৮৫–৮৬ সালে তাতে আবার অবনতি ঘটে (সারণি–৬)। পল্লীর খানা প্রতি আয় বন্টন একই রূপ থাকে কিন্তু বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। শহরের মাথাপিছু আয় বন্টনে বৈষম্য ১৯৮১–৮২ সালে বৃদ্ধিপায়, ১৯৮৩–৮৪ সালে হ্রাস পায় কিন্তু তা পুনরায় ১৯৮৫–৮৬ সালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শহরের খানা প্রতি আয় বন্টনের বৈষম্য ১৯৮১–৮২ সালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ১৯৮৩–৮৪ সালে হ্রাস পায়, ১৯৮৫–৮৬ সালে অনুরূপ অবস্থায় থাকে (সারণি–৬)।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আয় বন্টনের বৈষম্য ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে বাড়ে, আশির দশকের প্রথমার্ধে হ্রাস পায় কিন্তু শেষার্ধে আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপরন্তু, শহরের মাথাপিছু আয় বন্টনের বৈষম্য অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে।

বাংলাদেশে দারিদ্রের গতি-প্রকৃতি ও বিস্তৃতি পরিমাপ করা প্রকৃতপক্ষে একটি কঠিন কাজ। এ কাজটি বিঘ্নিত হয়েছে নানাভাবে। যে কয়টি গবেষণা/জরিপ হয়েছে তাতে গণনা ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। একটি সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এ সকল জরিপ পুনঃবিশ্লেষণ করলে যা প্রতীয়মান হয় তাহল গত ২৫

১৪। S. R. Osmani, Notes on Some Recent Estimates of Rural Poverty in Bangladesh, in *Special Issue on Poverty in Bangladesh,* BIDS, Vol. XVIII, Number 3, September 1990, p. 86.

১৫। Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 7 No. IA. মুশাররফ হোসেন লিখিত প্রবন্ধ "বাংলাদেশের দারিদ্র্য-সমস্যা ও সমাধান", পৃ: ১৪৬।

বছরে দারিদ্র যৎসামান্য কমেছে। ১৯৬৩–৬৪ সালের ৪৪ শতাংশ থেকে ১৯৮৯–৯০ সালের ৩৮ শতাংশে নেমেছে।[১৬] এ গণনার ভিত্তি হচ্ছে মাথাপিছু ব্যয়ের শ্রেণীবিন্যাস। সত্তরের দশকে যুদ্ধ–বিধ্বস্ত অর্থনীতির কারণে বা অন্য যে–কোন কারণে হোক দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আশির দশকে দারিদ্র হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮৭–১৯৮৮ সালে বন্যাজনিত কারণে দারিদ্র অবস্থার অবনতি ঘটে যা ১৯৮৮–৮৯ মাথাগুণতি সূচকে ধরা পড়ে। কিন্তু এ সংকট থেকে জনগণ নিজেদের কর্ম প্রচেষ্টায় বেরিয়ে আসে। এজন্য ৩৮ শতাংশ দারিদ্র নির্ণীত হয়।[১৭]

অনপেক্ষ দারিদ্র ছাড়াও বর্তমানে আর একটি দলের উৎপত্তি হয়েছে যাদেরকে চরম দরিদ্র বলা যায়। এদের আয় দারিদ্র–সীমার আয়েরও ৪৪ শতাংশ নিম্নে। অতি সম্প্রতি এদের অনুপাত মোট দরিদ্র খানার ৪০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।[১৮] এখানে উল্লেখ্য দারিদ্রকে সাধারণত ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ; যথা—চরম (Extreme), অনপেক্ষ (Absolute) এবং আপেক্ষিক (Relative) দারিদ্র। এরপরও আরও দু'টি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয় যাকে মাঝারি (Moderate) ও আলট্রা দারিদ্র বলে।

দারিদ্রের মন্থর উন্নতি আসলে মাঝারি দরিদ্রদের বিশেষ উপকারে এসেছে। অন্যপক্ষে চরম দরিদ্রের অবস্থা আরও সংকটজনক করে তুলেছে। ১৯৮৭–৮৮ এবং ১৯৮৯–৯০ সালে অনপেক্ষ দারিদ্রের অন্তর্ভুক্ত চরম ও মাঝারি দারিদ্র একযোগে ৫ শতাংশ কমেছে কিন্তু এসময়ে চরম দারিদ্র ২ শতাংশ বেড়েছে।[১৯] সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি গ্রামীণ দরিদ্রের উপকারে আসার কারণে এরূপ ঘটতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা চরম দরিদ্রের খুব সামান্য উন্নতি হয়েছে। অবশ্য এ অভিমত কতোটা যুক্তিযুক্ত তা বলা মুশকিল। কেননা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্মসূচি সমাজের বিত্তহীন নারী–পুরুষদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে যারা বাস্তবিকই চরম দরিদ্র। সুতরাং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরই বেশী উপকৃত হবার কথা।

অবশ্য, ১৯৮৮–৮৯ সালে পল্লীর প্রকৃত মজুরি হার কমেছে যা চরম দারিদ্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ সময়ে মজুরি ১০ শতাংশ বাড়লেও খাদ্যশস্যের মূল্য বেড়েছে ১৭ শতাংশ।[২০] এ অবস্থা মজুরদের ক্রয় ক্ষমতার নিম্নগতি নির্দেশ করে। আসলে বাংলাদেশে দারিদ্রের সামান্য হ্রাস–বৃদ্ধি খুব একটা বড় কথা বা বড় ঘটনা নয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে অসংখ্য ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, অসংখ্য বিত্তহীন, কর্মহীন নিরক্ষর মানুষ, শহরে–বন্দরে অসংখ্য বস্তিবাসী ও ভাসমান জনতা যে দরিদ্র তা বলাই বাহুল্য।

১৬। হোসেন জিল্লুর রহমান (১৯৯২) সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, নির্বাহী সার–সংক্ষেপ পৃ: III.
১৭। ঐ
১৮। ঐ
১৯। ঐ
২০। ঐ

এদের অধিকাংশ জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম। এরাই দরিদ্র। এ সকল দরিদ্র মানুষ দেশের সর্বত্র গ্রামে–গঞ্জে, শহরে–বন্দরে, আনাচে–কানাচে, ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে। গবেষণা/জরিপে এদের সংখ্যা একটু বেশী বা একটু কম নির্ধারিত হতে পারে। এতে দারিদ্রের অবনতি বা উন্নতি সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। কিন্তু দারিদ্রের উন্নতি–অবনতি যাই ঘটুক সাধারণভাবে যা বোঝা যায় তা হল, এ দেশে দারিদ্র এখনও ব্যাপকভাবে আছে এবং এটি এখনও একটি বিরাট সমস্যা।

দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার তুলনা করলে বোঝা যায় যে, এ দেশে দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কতোটা ব্যাপক ও গভীর। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক (১৯৯২) হিসেবে নিম্নে কয়েকটি দেশের দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের একটি বিবরণ প্রদত্ত হল :

সারণি – ৮

দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাত

বাংলাদেশ	৪৩%	পাকিস্তান	২৩%	শ্রীলংকা	২৭%
ভারত	৩৫%	ইন্দোনেশিয়া	১৭%		

বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার, চিকিৎসার সুবিধে, সঞ্চয় হার প্রভৃতি আঞ্চলিক দেশসমূহের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।

সারণি – ৯

অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক

	মাথাপিছু আয় (মা: ডলার)	প্রবৃদ্ধির % হার	মাথাপিছু জিডিপি	সঞ্চয় হার জিডিপির শতাংশ	বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতাংশ	শিক্ষার হার শতাংশ	ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা
বাংলাদেশ	২২০	৪.০০	১,২০৬	৩	২.৭	৩৫.৩	৬,১৬৬
পাকিস্তান	৪০০	৬.৪	২,১২৪	১২	২.৯	৩৫.০	১,৯৮৭
ভারত	৩১০	৪.২	১,১৯৮	১৯	২.১	৫১.১	২,০৭৫
শ্রীলংকা	৫৫০	৪.৫	২,৭৭২	১৩	১.৩	৮৮.৫	৫,৫১৬
থাইল্যান্ড	১৬৬০	৭.৪	৫,৬৬৫	৩২	১.৪	৯৩.০	৪,৩৬১
বার্মা	২৫০	১.২	৬৭৬	১৩	২.১	৮১.০	৩,৩৫০
ইন্দোনেশিয়া	৬৪৫	৫.৯	২,১৯৮	৩৬	১.৮	৮৫.০	৭,২৩৮
নেপাল	১৮০	৩.১	১,১৬৫	৫	২.৩	২৬.০	২০,২৩৪

সূত্র : এশিয়া উইক, মে ৫, ১৯৯৩।

সারণি—৯-এ বর্ণিত আঞ্চলিক দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক বিশ্লেষণ করলে অতি সহজেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রটি পরিষ্কার হয়। সাম্প্রতিক এক হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যার শ্রেণীভিত্তিক জাতীয় আয় বন্টনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রটি সারণি আকারে নিম্নে দেখানো হল :

সারণি - ১০
বাংলাদেশে জনসংখ্যার শ্রেণীভিত্তিক জাতীয় আয় বন্টন

আয় অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস	জনসংখ্যা (শতাংশ)	জাতীয় আয় বন্টন (শতাংশ)
ধনী	৫	২১
উচ্চ মধ্যবিত্ত	১৫	২৪
নিম্ন মধ্যবিত্ত	৪০	৩৬
গরিব ও বিত্তহীন	৪০	১৯

উপরের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে ৪০ শতাংশ গরিব ও বিত্তহীন জাতীয় আয়ের মাত্র ১৯ শতাংশ ভোগ করে, কিন্তু দেশের ৫ শতাংশ ধনী জাতীয় আয়ের ২১ শতাংশ ভোগ করে থাকে। অন্য হিসেবে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ (গরিব ও নিম্নবিত্ত) দেশের জাতীয় আয়ের ৫৫ শতাংশ ভোগী। এ চিত্রে যেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা হল গরিবদের বঞ্চনা, অর্থাৎ গরিবদের হাতে বা দখলে সম্পদ অতি অল্প। সুতরাং দারিদ্র জেকে বসে আছে। সম্পদ এভাবে কেন্দ্রীভূত হবার অনেক কারণ আছে। সে কারণগুলো নির্ধারণ করতে হবে। কারণ নির্ধারিত হলে সম্পদের সুষম বন্টনের পথ বাতলানো সহজ হতে পারে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি স্বত্ব

বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে পল্লীর দারিদ্র সম্পর্কে একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। সারণি—১১-তে এটা স্পষ্ট হয় :

সারণি – ১১
পল্লী বাংলার ভূমি মালিকানার প্রকৃতি

ভূমি মালিকানাভিত্তিক দল (একরে)	(১৯৭৮) খানার সংখ্যা (হাজার)	(১৯৭৮) শতাংশ	(১৯৮৩–৮৪) খানার সংখ্যা (হাজার)	(১৯৮৩–৮৪) শতাংশ	বার্ষিক পরিবর্তনের হার (শতাংশে)
কার্যত ভূমিহীন	৬২২৫	৪৮.৫	৬৩৯৯	৪৬.৩	০.৪
ভূমিহীন	১৯৭৯	১৫.৪	১১৯৮	৮.৭	৮.৭
০.৫ একরের কম	৪২৮৬	৩৩.৩	৫২৯৪	৩৭.৬	৩.৬
ভূমি খানা	৬৬৩১	৫১.৫	৭৪১৯	৫৩.৬	২.১
০.৫০–০–৯৯	১৫১৬	১১.৮	১৬৬০	১২.০	১.৭
১.০০–২.৪৯	২৬৬০	২০.৬	২৯৭৯	২১.৬	২.১
২.৫০–৪.৯৯	১৪৩৬	১১.১	১৫৮৯	১১.৬	২.০
৫.০০–৭.৪৯	৫০১	৩.৯	৬৫০	৪.৭	৪.৯
৭.৫০–১৪.৯৯	৩৭৪	২.৯	৪১৫	৩.০	১.৯
১৫.০০+	১১৪	০.৯	১১৭	০.৯	০.৫
মোট	**২৮৮৬**	**১০০.০**	**১৩৮১৮**	**১০০.০**	**১.৩**

সূত্র : বিবিএস, ১৯৮৩–৮৪ কৃষি শুমারী ও পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ।

উপরের তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষিখানা কার্যত ভূমিহীন। এ সকল খানার সদস্য প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। কৃষি খাতে যান্ত্রিক চাষাবাদ ও উন্নত ফলনশীল জাতের ফসলের চাষ হলে উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু এ উৎপাদন ভূমিহীন কৃষকের সরাসরি উপকারে আসে না। বাংলাদেশের অসম ভূমি বন্টনের কারণে ভূমি দরিদ্র বাড়ছে বই কমছে না। দরিদ্র খানার অধিকাংশ ভূমি দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কার্যত ভূমিহীন পরিবার দরিদ্রদের ৬৫ শতাংশ এবং প্রান্তিক চাষী ২১ শতাংশ (হোসেন জিল্লুর '৯২)। অবশ্য শ্রমিক খানার ৮৫ শতাংশ দরিদ্র। এদের মধ্যে পল্লীর কৃষি শ্রমিক খানার সংখ্যা অকৃষিখানার সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। কৃষির বিভিন্নমুখী সমসাও রয়েছে। সম্প্রতি যে সমস্যা হয়েছে তাহল কৃষক তাদের পণ্যের যে মূল্য পাচ্ছে তাতে তাদের উৎপাদন খরচ সংকুলান হয় না। দেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু ডাল, পেয়াজ, রসুন, তৈলবীজ প্রভৃতি কোনক্রমেই দেশের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এদিকে ধান ও পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদনকারী কৃষককূল দারুণ হতাশা ও বিপদগ্রস্ত। এর ফলে দেশে ধান ও পাট চাষে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যা ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

কৃষি উৎপাদন

১৯৬৭-৭০ সালের কৃষিজাত দ্রব্যের বার্ষিক উৎপাদনের তুলনায় ১৯৮১-৮৪ সালের বার্ষিক উৎপাদন বেড়েছে মাত্র শতকরা ১.৩৪ ভাগ। শুধু চাল ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১.৭৭ ভাগ। ১৯৭৫-৭৬ সাল থকে ১৯৭৮-৭৯ সালে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.১০ ভাগ, চাল ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৯ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিম্ন।[২১] চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭২/৭৩—১৯৭৯/৮০ সালে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি ৩.৫% থেকে কমে ১৯৮০/৮১—১৯৮৪/৮৫ সালে ২.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। যদিও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু এ বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২৫ লাখ লোক বাড়ছে। এদের মধ্যে প্রায় ৮ লাখ লোক কর্মপ্রত্যাশী হয়ে প্রতি বছর শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে। শহরে এদের বছরে ২/৩ লাখের বেশী কর্মসংস্থান হয় না। বাকী ৫/৬ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য পল্লী অঞ্চলে রয়েছে কৃষিকাজ। অথচ বছরে ৭০ হাজার লোকের বেশী এক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না।[২২]

কৃষি খাতে ১৯৭৪ অর্থ বছর হতে ১৯৮৪-৮৫ সালে বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল শূন্য। এ সময়ের অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে বার্ষিক ২.৯ শতাংশ হারে (মাহবুব হোসেন, মে ১৯৮৮)। তৃণা হক মনে করেন যে, আসলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার বিস্তৃতি সঠিকভাবে পরিমাপ করা খুবই কঠিন। কেননা, এখানে শ্রমের অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজার থাকার কারণে সরাসরি এ পরিমাপে অসুবিধা হয়।

সারণি - ১২

বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন হার : কেজি/হেক্টর, ১৯৮৪

	ধান	গম	পেয়াজ	আলু	বাধাকপি	টমেটো	আখ	পাট
বিশ্ব	৩২২১	২২১৭	৩৬৮৬	১৪,৮৩১	২৩,০৯৬	২৫,৫০৭	৬১,১৫০	২০৯৪
এশিয়া	৩২৮৯	২১৩৫	২৫৯৫	১২,৫৫৯	২০,২৯৬	১৯,০১৭	৫৫,০৫১	২১৩৫
বাংলাদেশ	২১০০	২১৬৬	৪৯২	১০,৪৪৬	৮,২৮৯	৭,৭৩২	৪২,২০৯	১১৫২

সূত্র : খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বর্ষগ্রন্থ, ১৯৮৫।

উপরের তথ্যে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হার বিশ্বের ও এশিয়ার ঐ হারের চেয়ে কত কম। অথচ বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান দেশ, দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষক। কৃষিই বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কিন্তু কৃষির এ দৈন্য-দশা দেশের দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

২১। বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি-তে লিখিত মুশাররফ হোসেন-এর 'বাংলাদেশের দারিদ্র : সমস্যা ও সমাধান', প্রাগুক্ত পৃ : ১৪২।

২২। ঐ

বাংলাদেশের লোক সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে স্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে বাড়তি মানুষের জন্য খাদ্য সমস্যা ভবিষ্যতে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে। এজন্য প্রয়োজন ফলন বৃদ্ধি ও কৃষি সম্প্রসারণ। দেশের মোট আবাদী জমির ২০ শতাংশ সেচ সুবিধে পাচ্ছে। তাছাড়া উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশকের অপ্রতুল সরবরাহও এ অবস্থার জন্য দায়ী। উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভবপর নয়। সেই সঙ্গে সেচের সুবিধে আরো অনেক বাড়াতে হবে। কেননা, সেচের দ্বারা যেমন ফলন অনেক বাড়ে, তেমনি একই জমিতে দু'তিনটে ফসলও করা সম্ভবপর হয়। অতএব, সেচ সুবিধের সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা

নিরক্ষরতা বা অল্পশিক্ষা দারিদ্রের সঙ্গী। এ দু'টি অবস্থা সাধারণত একই সঙ্গে বিরাজ করে। শিক্ষার অভাব বা স্বল্পতা–হেতু দারিদ্র সৃষ্টি হয় ও বৃদ্ধি পায় ; আবার দারিদ্রের কারণে শিক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশে দারিদ্র অধিক। এজন্য নিরক্ষরের হারও অধিক। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার সকল দেশের অনেক পেছনে পড়ে আছে। তাই এদেশে এখনও ৬৭.৬ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। পুরুষের নিরক্ষরতার হার ৬১.১ শতাংশ এবং মহিলা নিরক্ষরতার হার ৭৪.৫ শতাংশ।*

শিক্ষার প্রয়োজন নানা কারণে। তবে শিক্ষা দারিদ্র বিমোচনে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তদ্বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। একজন সাক্ষর মানুষ নিজের সবল ও দুর্বল দিক এবং উন্নতির রহস্য যতটা সহজে বুঝতে পারে একজন নিরক্ষর লোক তত সহজে সেটা পারে না। শিক্ষা শক্তি যোগায় ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে। একজন গরিব শিক্ষার মাধ্যমে তার অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে, বুঝতে পারে কারা, কিভাবে তাকে শাসন ও শোষণ করছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা গরিবের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এ শিক্ষা যে সর্বক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বা পুথিগত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। গরিবের জন্য এমন শিক্ষা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে যা তাদের আয় ও উন্নতির পথ সুগম করতে পারে। বয়স্ক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষা কার্যক্রম ভিন্নভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার।

গরিব পরিবারের ছেলে–মেয়েরা অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেয়। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা তাদের কর্মসংস্থানের সহায়তা করে। এক্ষেত্রে হাঁস–মুরগী ও মাছের চাষ, গরু–বাছুর লালন–পালন, শাক–শব্জীর চাষ, কুটীর ও হস্তশিল্পের কাজ প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক ও

* গত ১–৩–১৯৯৪ তারিখে সংসদে প্রশ্নোত্তর দানকালে শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে (দৈনিক সংবাদ ২রা মার্চ, ১৯৯৪)।

প্রায়োগিক জ্ঞান দান করার ব্যবস্থা করা যায়। শুধু প্রাথমিক নয়, এ সকল বিষয় উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কেননা, আজকাল উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা অগণিত ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে অসমর্থ হয়। উপরোক্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকলে তারা স্বপ্রচেষ্টায় ও স্ব স্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে বেঁচে থাকার জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। অতএব, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করা দরকার। তাত্ত্বিক বিষয়ে অত্যধিক ও অপ্রয়োজনীয় বোঝা চাপিয়ে শিক্ষাকে অপ্রায়োগিক করা হয়েছে। যে জন্য আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছে।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, দেশে অধিকাংশ গরিব মানুষ সাক্ষর নয়। এরা সমগ্র গরিবদের ৫৫ শতাংশ এবং চরম গরিবের ৬০ শতাংশ (হোসেন জিল্লুর—৯০)। এদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যায় না। বড়দের সঙ্গে অতি ছোটবেলা থেকে এরা কাজে লেগে যায়। এমন একটা সময় বেছে নিয়ে এদেরকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করা দরকার যখন এদের অবসর থাকে। কেবল, তাহলেই এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালেয় শিক্ষা দেয়া সম্ভবপর হবে। খাদ্য, বই ও জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করলে অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু ইপ্সিত ফললাভ হবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় ও মহল্লায় মহল্লায় শিশুদের ছোট ছোট নৈশ বিদ্যালয় খোলা যায়। এ সকল বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে অসমর্থ কেবল তারা এখানে পড়বে। এ বিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই-পুস্তক-খাতা প্রভৃতি সরবরাহ করতে হবে।

শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে একটা আন্দোলনে রূপ দেয়া প্রয়োজন। অশিক্ষিত পিতা-মাতা যেন বুঝতে পারে যে, তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানো একটা নৈতিক দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় বিষয়। যে শিক্ষা লাভ করে ছেলে-মেয়েরা তাদের কাজে আসবে, পরিবার উপকৃত হবে সে শিক্ষার জন্য নিশ্চয়ই অভিভাবকেরা আগ্রহী হবে। যে শিক্ষা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুভূত হবে, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলে সে শিক্ষার জন্য আগ্রহী হবে। যে দিন শিক্ষা পরিবার ও সমাজের দাবি ও চাহিদা মেটাতে পারবে কেবল সেদিনই শিক্ষার জন্য সকলে আন্তরিক হবে। শিক্ষাকে একগাদা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একগাদা কাজের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশে দারিদ্রের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হলে তা মাথাপিছু আয় ও খাদ্য বন্টনে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন, পরিবেশ, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে ভূমি টুকরো টুকরো হওয়া, ভূমিহীনের ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, শহরে

ছিন্নমূল মানুষের ভীড় বাড়া। প্রয়োজনাতিরিক্ত ও অপরিকল্পিত জনসংখ্যা সমাজে অরাজকতা ও অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে ষাটের দশকে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.৫ শতাংশ এবং ১৯৭৫–৭৬ সাল থেকে বার্ষিক জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৯ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধি সে সময় কম ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জন্য তা নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই ষাটের দশকে মাথাপিছু আয় বাড়ে মাত্র ০.৬ শতাংশ এবং সত্তরের দশকে ১.৫ শতাংশ। বাংলাদেশে সঞ্চয়ের হার এজন্যই অত্যন্ত কম। আর সে কারণে মূলধন গঠনে হয় প্রবল সমস্যা। খাদ্যশস্য উৎপাদন ষাটের দশকে ১০ মিলিয়ন টন থেকে আশির দশকে ১৬ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়। সুতরাং খাদ্যশস্য ঘাটতি পূর্বের মতোই অর্থাৎ ১.৫ মিলিয়ন থেকে ২.০ মিলিয়নে থাকে। অর্থাৎ বাড়তি উৎপাদন বাড়তি জনসংখ্যা সাবাড় করে দেয়।

জনসংখ্যার একটি বিপুল অংশের (৬৭ শতাংশ) বয়স ১৫ বছরের নিম্নে হওয়ায় তারা দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। অন্যদিকে এরা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নানা প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১০ মিলিয়ন। তৎপর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা সোয়া বারো কোটির বেশী। ১৯৭৪–৮১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৮ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় ২.৭ শতাংশে। কারো কারো মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে ২.২ শতাংশ। এখনই যদি ২ শিশু পরিবার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় তাহলেও ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ২৩ কোটি।[২৩] এমনকি এ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটিতে উন্নীত হবে। এতো অধিক সংখ্যক মানুষ ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল আয়তনের একটি দেশে খাইয়ে–পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখা মোটেও সহজ হবে না। তাই দেশের সামনে এখন দু'টি বড় চ্যালেঞ্জ। এক, জনসংখ্যা রোধ কর্মসূচি জোরদার ও ফলপ্রসূ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সীমিত রাখা ; দুই, ইতোমধ্যে সৃষ্ট জনসংখ্যাকে বিভিন্ন কৌশলে ও কর্মসূচি অবলম্বনপূর্বক অর্থনৈতিক ক্রিয়া–কর্মে নিয়োজিত করা।

খাদ্য ও পুষ্টি

দারিদ্র নির্ণয়ে পুষ্টি ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাপ আধুনিককালে সর্বজনগ্রাহ্য একটি পদ্ধতি। ক্যালরি গ্রহণের নির্দিষ্ট সীমা অনুপাতে পল্লীর ও শহরের মানুষের দারিদ্র পরিমাপের কয়েকটি সারণি ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ক্যালরি গ্রহণের

২৩। প্রগতি : শিশুর ও উন্নয়ন লক্ষ্য (১৯৯০–৯৫) অর্জন, ইউনিসেফ, ১৯৯২ ঢাকা-তে মোকাম্মেল হক লিখিত মুখবন্ধ পৃ: ১।

পরিমাণ পরিমাপ করা নানাকারণে একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণের সম্পর্ক, দেশের মানুষের আয়-ব্যয়, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যের সহজলভ্যতা, মূল্য, উৎপাদন প্রভৃতি নানা বিষয় ও ঘটনা।

বাংলাদেশে ১৯৭৩-৭৪ সালের খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ১৯৮৫-৮৬ সালে বৃদ্ধি পায়। এ পরিমাণ নিম্নের সারণিতে দেখা যেতে পারে :

সারণি-১২

গ্রাম

	শহর	পল্লী
১৯৭৩-৭৪	৭১৩	৬৭৫
১৯৮১-৮২	৭৪৯	৬৮৫
১৯৮৩-৮৪	৭৫৫	৭৩৫
১৯৮৫-৮৬	৮১৪	৮০৪

সূত্র : মাহবুব হোসেন, মে, ১৯৮৮।

বাংলাদেশে ১৯৮৪-৮৫ সালে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ গড়ে প্রতিদিন ১৪ আউন্স খাদ্যশস্য গ্রহণ করে। গরিবদের মধ্যে ১৭% গড়ে দৈনিক ৮ আউন্স, ৫৩% দৈনিক ১২.৫ আউন্স এবং ৩০ শতাংশ দৈনিক ২০ আউন্স খাদ্য গ্রহণ করে।[২৪]

শিশু-পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যে দৃষ্ট হয় যে, শিশুদের চরম অপুষ্টি ১৯৭৫-৭৬ সালে ২৫.৮ শতাংশ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৯.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু মাঝারি ধরনের অপুষ্টি ৫৩.০ শতাংশ থেকে ৫২.২ শতাংশে দাঁড়ায় (মাহবুব হোসেন, মে, ১৯৮৮)। অবশ্য, ১৯৯০ সালে সামগ্রিক পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। এ সময় ৫ বছরের নিচের শিশুদের ৫০ শতাংশ অপুষ্টির শিকার হয়। বাংলাদেশে ৩৫.২% শিশুর শারীরিক বর্ধন চরমভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ৩০.৩% শিশু মোটামুটিভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ১/৩ ভাগ শিশু ওজনে কম থাকে এবং ১৪% শিশু নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়।[২৫]

বাংলাদেশে মহিলাদের পুষ্টির অবস্থা আশংকাজনকভাবে খারাপ। পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ মহিলারা দৈনিক মাথাপিছু ১৩০০ কি: ক্যা:-এর বেশী গ্রহণ করতে পারে না। দেশের ৮৫ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগে। এমনকি মেয়েদেরকে ছেলেদের চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণে বাধ্য অথবা অভ্যস্ত করা হয়। মা-বাবার নিকট পুত্র সন্তান সম্পদ, কন্যা সন্তান বিপদ ও দায় হিসেবে বিবেচিত হয়। বিদ্যালয়ে পাঠাবার ক্ষেত্রেও বৈষম্য বিদ্যমান। এ জন্য বাংলাদেশে মহিলা শিক্ষিতের হার ২৯ শতাংশ অথচ পুরুষ শিক্ষিতের হার ৪৫ শতাংশ (হোসেন জিল্লুর—৯২)। মাত্র ৮ শতাংশ পুরুষ প্রধান খানা

২৪। মুশাররফ হোসেন, বাংলাদেশের দারিদ্র : সমস্যা ও সমাধান, প্রাগুক্ত পৃ : ১৪৬।

২৫। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন : বিবিএস-এর Report of the Child Nutrition Status Survey, 1989-90 যা ১৯৯১-এর এপ্রিলে প্রকাশিত হয়।

চরম দরিদ্র অথচ ৩৩ শতাংশ মহিলা প্রধান খানা চরম দরিদ্রের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৮–৮৯ সালে মহিলা প্রধান খানা পুরুষ প্রধান খানার চেয়ে গড়ে ৪০ শতাংশ কম আয় করেছে। পল্লীর ৯ শতাংশ খানা মহিলা প্রধান ও মহিলা দ্বারা চালিত। এরাই সবচেয়ে নড়বড়ে এবং অসুবিধেভোগী একটি সামাজিক শ্রেণী।

বেকারত্ব

বাংলাদেশে বেকারত্ব ও অর্ধ–বেকারত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। কেউ কেউ বলেন ২ কোটি শিক্ষিত/অশিক্ষিত মানুষ বর্তমানে বেকার ও অর্ধ বেকার। ১৯৬১ সালের আদম শুমারিতে ৫০.৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ০.০৮ মিলিয়ন বেকার এবং ১৯৭৪ সালের আদম শুমারিতে ৭৬.৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার ০.৫০ মিলিয়ন বেকার দেখানো হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে ০.৩০ কোটি শ্রমবর্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে যা প্রকৃত শ্রমশক্তির বৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। ১৯৭৯–৮০–তে ২৭.৪৭ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে ২৫.৩ মিলিয়নের কর্মসংস্থান হয়, বেকার থাকে ২.১৭ মিলিয়ন যা মাথাপিছু গণনার ভিত্তিতে শ্রমশক্তির ৮ শতাংশ।[২৬]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাক্কালে বলা হয়েছিল প্রায় ৮৫ শতাংশ লোক চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করে,৭৪ শতাংশ মানুষ লিখতে ও পড়তে জানে না, ৩৩% মানুষের কোন কর্মসংস্থান নেই। এ সময় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, "এ সমস্যা একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের আকার নিচ্ছে"। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ একান্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের সংখ্যা ১১৩ মিলিয়ন–এ দাঁড়াবে।

পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমতি হয়েছিল। এ বর্ধিত কর্মসংস্থানের ৬৮ শতাংশ হবে কৃষি–ক্ষেত্রে। কৃষিক্ষেত্রে ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে কর্মসংস্থানের এ লক্ষ্য অর্জিত হবে এবং ফলে দারিদ্র বিমোচন ঘটবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনের সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্কের বিষয়টি এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদনের সঙ্গে ভূমিবান ও ভূমিহীনদের সম্পর্ক একরূপ নয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে অবশ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এ সময় এ বৃদ্ধির হার এমন নয় যে তা শ্রমবাজারে অধিক চাহিদা সৃষ্টি করতে পেরেছে।

১৯৮৯ সালে বেসামরিক শ্রমশক্তি ৫০.৭ মিলিয়ন স্থিরীকৃত হয়, অথচ ১৯৮৫–৮৬ সালে উক্ত শ্রমশক্তির পরিমাণ ছিল ৩০.৯ মিলিয়ন এবং ১৯৭৯–৮০ সালে ২৭.৪৭ মিলিয়ন। এত বড় আকারের পরিবর্তনের কারণ হল ১৯৮৫–৮৬ সালে মহিলা শ্রমশক্তি বৃদ্ধি ঘটে কৃষিখাতে। ১৯৮৯ সালে শ্রমশক্তি জরিপের প্রশ্নমালায় মহিলাদের কিছু নির্দিষ্ট শ্রম এলাকা অন্তর্ভুক্ত করায় এ পরিবর্তন সূচিত হয়। পূর্বে মহিলাদের কৃষি ক্ষেত্রে এ সকল কাজ অর্থনৈতিক কর্ম বলে পরিগণিত করা হয়নি। এ সকল কাজ কর্মসংস্থান

২৬। পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ সরকার : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ঢাকা ১৯৭৮, পৃ : ১৯

হিসেবে বিবেচিত না হলে মহিলা কর্মসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৬ মিলিয়ন এবং মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ হয় ৩৬ মিলিয়ন। সুতরাং কর্মসংস্থানে প্রকৃত সংখ্যা নির্ভর করে কোন্ শ্রেণীর কাজ অর্থনৈতিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে তার ওপর।

সারণি – ১৩

শ্রম ও শ্রমশক্তি খাতের সূচক

বৈশিষ্ট্য সূচক	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৮৫–৮৬	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৮৯	শ্রমশক্তি জরিপ ১৯৯০ (পি)
১। মোট বেসামরিক জনশক্তি (মিলিয়ন) :			
পুরুষ	২৭.৭	২৯.৭	৩১.১
মহিলা	৩.২	২১.০	২০.১
মোট (পুরুষ+মহিলা)	৩০.৯	৫০.৭	৫১.২
২। বেকার জনসংখ্যা (মিলিয়ন) :			
পুরুষ	০.৩	০.৪	০.৬
মহিলা	০.১	০.২	০.৪
মোট	০.৪	০.৬	১.০
৩। বেকারত্বের হার (অর্ধ–বেকারত্ব বাদে) :			
পুরুষ	০.৮	১.৩	১.৯
মহিলা	৩.২	১.১	১.৯
উভয় (পুরুষ+মহিলা)	১.১	১.২	১.১

সূত্র : বিবিএস, পকেট বই, ১৯৯৩, পৃ : ৯৯।

আসলে দেশে অর্ধ–বেকারত্বের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী যা ৩৫% থেকে ৪০% বলে হিসেব করা হয়। ১৯৯০ সালে মোট শ্রমশক্তি ৩৭.১৩ মিলিয়ন ধার্য হয় যার ২৩.২৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান করার কথাও বলা হয়.। কিন্তু কর্মসংস্থানের এ লক্ষ্যমাত্রার ধারের কাছেও যাওয়া সম্ভব হয়নি। কর্মসংস্থান সম্পর্কে নিম্নের সারণিটি লক্ষণীয়:

সারণি – ১৪

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা

কর্মসংস্থান	শ্রমশক্তি জরিপ **১৯৮৪–৮৫**	শ্রমশক্তি জরিপ **১৯৮৫–৮৬**	শ্রমশক্তি জরিপ **১৯৮৯**
কৃষিতে (হাজারে)	১৬,৭১২	১৭,৪৮৪	৩২,৫৭৩
শিল্প	২,৬৮৮	৩,০১৯	৬,৯৭৭
আত্ম কর্মসংস্থান	৩৯.৪	৩৮.০	২৯.৬
দিন–মজুর	৩৯.৫	১৯.০	৯.৫

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯২, পৃ : ৮৪।

উপরের তথ্যে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে কৃষি, শিল্প, আত্মকর্মসংস্থানে ও দিন–মজুরিতে যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় তা দেশের ক্রমবর্ধমান শ্রমের বাজারের চাহিদা

মেটাতে সমর্থ হয় না। এ জন্য দেশের শ্রমশক্তির একটা বিরাট অংশ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত থাকে। উৎপাদনের এ সকল ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করতে না পারলে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরীভূত হবে না এবং বেকারত্ব দূরীভূত না হলে দারিদ্র বিমোচনও সম্ভবপর নয়।

পাকিস্তান আমলে দারিদ্র বিমোচন

পাকিস্তান আমলে এ দেশে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র বিমোচনের উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচি ছিল না। ১৯৫৩ সালে ভি-এ আই ডি অর্থাৎ ভিলেজ এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ভি-এ আই ডি কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লীর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। ১৯৬০-৭১ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার পল্লীর দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। সে সময় কৃষির উন্নতির মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করতে দেশের কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল সরকারের বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। এতদুদ্দেশ্যে তারা পরিকল্পনা, প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এ জন্য উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি সরবরাহ ও জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার বিভিন্নভাবে সচেষ্ট হয়। এ সকল কর্মসূচি সরাসরি দারিদ্র পরাস্ত করার জন্য নয়, বরং পরোক্ষভাবে দারিদ্র নিরসনের সহায়ক ছিল। এরপর কৃষি ঋণ দেয়ারও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী আখতার হামিদ খান কুমিল্লা দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর সৃষ্ট টিটিডিসি'র মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে জলসেচ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা সেচ প্রকল্প ও গণ-স্বেচ্ছাশ্রম প্রকল্পের প্রবর্তন হয়। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে খাল খনন ও পুনঃখনন, কাঁচা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, ছোট-ছোট পুল, কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করা হয়। বিএডিসি'র মাধ্যমে জলসেচের জন্য লো-লিফ্ট পাম্প সরবরাহ করা ও গভীর ও অগভীর নলকূপ বসানো হয়। বিএডিসি উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করে। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতিতে গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির স্থলে কিছু সংস্কার করে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এ বোর্ড সৃষ্টির পশ্চাতে ৫টি মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ; যথা—(ক) অধিক হারে কৃষি উৎপাদনে গতি সঞ্চার, (খ) পল্লীর গরিবদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, (গ) সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত হারে সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি, (ঘ) উন্নয়ন সেবা-প্রদান বৃদ্ধির জন্য পল্লীতে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টি। আয়ুব খানের বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের কিছু কিছু কাজ করা হয়। তখনকার সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি নামে কোন কর্মসূচি তখন সরকারের পরিকল্পনায় ছিল না।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দারিদ্র বিমোচন

স্বাধীনতার পর যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় তার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্বের সমাধানপূর্বক দারিদ্র সংকোচন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে সঠিক মুদ্রানীতি ও মূল্যনীতি অবলম্বন ও বাস্তবায়নপূর্বক সম্পদের সুষম বন্টন। এ ছাড়াও এ পরিকল্পনার আরো ১১টি বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল দেশীয় সম্পদ আহরণ, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, সম্পদের ও আয়ের সুষম বন্টন এবং বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার ন্যূনপক্ষে ৫.৫ শতাংশ অর্জন প্রভৃতি (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পৃ : ৯–১০)। দারিদ্র বিমোচনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও এ পরিকল্পনাকালে নানাবিধ কারণে দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর আরো একটি দ্বি–বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮–৮০) গৃহীত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০–৮৫) শুরু হয়। এ পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বাংলাদেশীদের মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ মার্কিন ডলার, দারিদ্র ছিল সর্বব্যাপী। এ জন্য এ পরিকল্পনায় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাস্তবোচিত পন্থায় দেশে দারিদ্র উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসকরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। আবশ্যিক শর্ত হিসেবে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। দেশজ সম্পদ ও গ্রামীণ সম্পদ পানি, মাটি ও মানুষের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কথা উল্লেখ করা হয় (২য় পঃ বা: প: পৃ: ৩১)।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনকল্পে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। যদিও এ কর্মসূচি পল্লীপূর্ত কর্মসূচির চেয়ে বৃহদাকার ছিল কিন্তু তা দারিদ্র নিরসনের জন্য কোনোমতেই স্থায়ী কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এ কর্মসূচির অধীন প্রকল্পে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সাময়িক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবং কাজের বিনিময়ে যে গম শ্রমিকরা পায় তাতে অনাহার দূরীভূত হয়। এ সময়ে চুইয়ে পড়া অর্থনীতির অসারতাও প্রমাণিত হতে থাকে। মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। এ জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতি সরকার ও পরিকল্পনাবিদরাও মনোযোগী হয়। উচ্চফলনশীল প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রভৃতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এ সময় গুরুত্ব পায়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন দর্শনের চিন্তাধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় কাঠামোগত পরিবর্তন, উদার ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রভৃতি ধারণা অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। এ সময়ে পূর্বের মতোই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পল্লী–পূর্ত কর্মসূচি, খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচি, ভিজিডি কর্মসূচি, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি ও সমন্বিত

পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি দেশের দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখে। কিন্তু তা দেশের অগণিত ও বৃহত্তর গরিব জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হয় না। ১৯৭৪–৮৫ সময়কালে এমন চিত্র ও প্রমাণ পাওয়া যায় না যাতে মনে করা যায় যে, প্রথম তিনটি পরিকল্পনার দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।[২৭]

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অনুভূত হয় যে, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি যদিও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অসমর্থ। সুতরাং এ পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দরিদ্রের সুযোগ–সুবিধে বর্ধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দলভিত্তিক পরিকল্পনা এবং দরিদ্রের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন। দরিদ্র ও অসুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নের জন্য কৌশল, নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ ও মহিলাদেরকে অন্যান্যদের সঙ্গে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা বিতরণ। দেশে নিচের মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি, বর্ধিত হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উন্নয়নের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু এ সকল দারিদ্র বিমোচনে প্রত্যক্ষভাবে কাজে আসেনি। দেশে কর্মসংস্থান, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি কোনটাই হয়নি। তাছাড়া, দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, পন্থা, পরিকল্পনা, কোনটাই তখন পর্যন্ত সুচারুরূপে গৃহীত হয়নি, যেজন্য দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিও স্থায়ী রূপ পায়নি। অবশ্য দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি শিরোনামে পরিকল্পনা কমিশনে একটি সেল খোলা হয়েছে।

পরিকল্পনাবিদদের ধারণা প্রবৃদ্ধি ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি দেশের প্রবৃদ্ধির জন্য বিশেষ উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় পরিকল্পনায় সরাসরি এ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।[২৮] এ দিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৫%, অর্জিত হয়েছে ৪%, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪%, অর্জিত হয়েছে ৩.৮%, তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪%, অর্জিত হয়েছে ৩.৮%। সুতরাং প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কখনই অর্জিত হয়নি।

ডঃ ইউনুস মনে করেন যে, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করতে পারলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা দেশী পণ্য কিনবে। এতে দেশী পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, অর্থনীতি গতিশীল হবে। অন্যপক্ষে ধনীদের আয় বৃদ্ধি পেলে তারা বিদেশী ভোগ্যপণ্য ক্রয় করবে, দেশে বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টি হলে দেশ পরনির্ভরশীল হবে, অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে।[২৯]

২৭। রেহমান সোবহান–এর সভাপতির ভাষণ 'বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি, খণ্ড : ৭নং ১–এ, ১৯৮৬, ঢাকা পৃ : ১০।

২৮। মুহম্মদ ইউনুস, "প্লানিং ফর দি পুওর", বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি, প্রাগুক্ত পৃ: ১৩৯।

২৯। ঐ

আসলে দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি উৎপাদনশীল কাজে লেগে যায় এবং হাজারো রকম পণ্য উৎপাদন শুরু করে, তাহলে দেশে পণ্যের অভাব ঘুচবে, দেশ আত্মনির্ভরশীল হবে, অর্থনীতি স্বয়ম্ভর হবে। দেশে যে বিরাট জনগোষ্ঠি রয়েছে তাকে উৎপাদনশীল শক্তিতে রূপান্তরিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই জাতীয় পরিকল্পনায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে উৎপাদনশীল কর্মে লিপ্ত করার ওপর গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি এখন জোরে-শোরে উচ্চারিত হচ্ছে। "জনতা জাগলে দেশ জাগবে" এটাই হবে আজকের শ্লোগান। সেজন্য পরিকল্পনায় শুধু ধনীদের জন্য কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ থেকে বিরত থেকে, গরিবদের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। যারা দেশের আনাচে-কানাচে অনাদরে-অবহেলায় উপেক্ষিত ও শোষিত হচ্ছে তাদের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দেশের সার্বিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ওদেরকে টেনে ওঠাতে না পারলে, ওরাই ধনীদের টেনে পশ্চাতে নিয়ে যাবে। অথবা ওরা ধনীদের স্থান জোর করে দখল করে বসবে। এ দু'য়ের কোনটাই কোনদিন সুখকর হবে না। তাই দেশের যে পরিকল্পনায় সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হয়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি ও দর্শন স্থিরীকৃত হয় সে পরিকল্পনায় বৃহত্তর সমাজের ও মানুষের সরাসরি উন্নতির জন্য অর্থ ও দিগদর্শন থাকা প্রয়োজন।

বৈদেশিক সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা

বাংলাদেশ ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থা থেকে ৬০,৪০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে। বলা যায় বাংলাদেশের পুরো অর্থনীতিটাই বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ সাহায্য দ্বারা বাংলাদেশে যে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে তার সুবিধাভোগী কারা? এ প্রশ্নের উত্তরে অতি সহজভাবে বলা যায় যে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত, ধনী, ব্যবসায়ী, আমলা ও অন্যান্য অনেকে। এরা কেউ গরিব মানুষের পরিবার থেকে আসেনি। বৈদেশিক ঋণ দ্বারা যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে দরিদ্র মানুষের অতি সামান্য অংশ শ্রমিকের কাজ পেয়েছে। কিন্তু ঐ সকল শিল্পের বা পাবলিক এন্টারপ্রাইজের অধিকাংশই আজ লোকসান দিচ্ছে এবং শেষ নিঃশ্বাসের দিন গুণছে।

কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য এসেছে এবং তদ্দ্বারা যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তার সুফল হতে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি বঞ্চিত হয়েছে। তাছাড়া, বৈদেশিক সাহায্যের একটা বড় অংশ চলে গেছে গাড়ি-ঘোড়া ও প্রযুক্তি ক্রয়ে, দালান-কোঠা নির্মাণে, বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের বেতন ও ভাতা প্রদানে। ঠিকাদার, ইনডেন্টর, আমদানীকারক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা এ সকল প্রকল্প থেকে লাভবান হয়েছে।[৩০] অনেক বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প নানা কারণে বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে, ফলে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি। উপরন্তু,

৩০। রেহমান সোবহান-এর সভাপতির ভাষণ : প্রাগুক্ত পৃ : ১৫।

প্রকল্প ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। অথচ দেশ এখন বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত। মথাপিছু এ ঋণের বোঝা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। প্রতি বছর প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ডেট সার্ভিসিং-এর জন্য গুণতে হচ্ছে। বাংলাদেশকে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত ১২,৮০০ কোটি টাকা সুদ-আসলে পরিশোধ করতে হয়েছে।[৩১]

দারিদ্র বিমোচন, দুর্বলকে সবলকরণ ও ক্ষমতা প্রদান

দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসেবে ইদানীং নানা মতবাদের ও তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। গম/রিলিফ দিয়ে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক পন্থা আবিষ্কার ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন। গরিবের হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন তাদের সাক্ষর ও কাজের জন্য প্রস্তুত করা, কাজ দেয়া, আয়ের সংস্থান ও স্বকর্মের ব্যবস্থা করে দেয়া, আয়ের মাধ্যমে সঞ্চয় ও পুঁজি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা, সম্পদ ও ক্ষমতার অংশীদার করা এবং তাদেরকে যাবতীয় শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত রাখা। তাদের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও দলভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ গরিবের জন্য ও তাদের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে তদ্দ্বারা ঐ সকল কর্মসূচি সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে গরিবের হাতকে মজবুত ও শক্তিশালী করার পরই তাদের দারিদ্র মোচন সম্ভব।

দরিদ্রের জন্য পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বরাদ্দ করে তার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্রদের যথাযথ ভূমিকা, প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে দরিদ্রের ন্যায্য পাওনা বিতরণের সঠিক পন্থা চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার। দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচিতে যে অর্থ ব্যয় হবে তা কেবল দরিদ্ররাই ভোগ করবে। সেটা তারা কাজের ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে করবে। এ অর্থে অন্য কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। উপরন্তু, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে অর্থ ব্যয় হবে, যে কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণীত ও বাস্তবায়িত হবে তাতেও তারা অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে।

ভূমি সংস্কারের নামে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি মালিকানায় প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি। ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না। দরিদ্র চাষীদের চাষাবাদে সহায়তার জন্য ভূমি বন্টন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। প্রকৃত চাষীর ও ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারী খাস জমির বন্টন করা যেমন দরকার, তেমনি সে জমিতে তারা যেন চাষাবাদ করতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থাও করা দরকার। দেশে আজ অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের সংখ্যা অনেক। এদের জমি বর্গাদাররা চাষ করে, মালিকরা যা পায় তাই তাদের নিকট যথেষ্ট। তারা জমির চাষাবাদের খোঁজ-খবর কমই নিয়ে থাকে। প্রয়োজনে লাঙ্গল যার জমি

৩১। বিবিএস, পকেট বই, ১৯৯৩, পৃ : ৬।

তার এ রকম ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থা যদি একান্তই কায়েম করা সম্ভবপর না হয় তাহলে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে অনুপস্থিত ভূমি মালিকগণ তাদের জমি চাষাবাদের খোঁজ-খবর রাখতে, মূলধন ও কৃষি উপকরণ যোগান দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে তারা জমির প্রতি অধিক যত্নবান ও আগ্রহী হবে। অন্যথায়, বর্গাদারদের এমন সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে যাতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে চাষে লিপ্ত হয় এবং ফসলের ভাগ এমনভাবে পায় যাতে তাদের লোকসান না হয়ে লাভ হয়।

শুধু আইন করে এরূপ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভবপর হবে না। কৃষকদের সংগঠন ছাড়া তাদের দাবী-দাওয়া তারা কোনদিনই আদায় করতে পারবে না। দেশে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের সংগঠন আছে, কিন্তু ভূমিহীন গরিব কৃষকের কোন সংগঠন নেই। তাই তারা তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে পারে না। কৃষক সংগঠনই পারে কৃষকদের সকল প্রকার দাবি ও পাওনা আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। কিন্তু এই যে এতসব 'করা' তা কিভাবে সম্ভব? যার মাথায় বোঝা, তাদেরই বোঝা বহন করতে হয়। অন্যেরা বহন করবে না। সুতরাং দরিদ্র মানুষের দারিদ্র তাদেরকেই হটাতে হবে। ধনী বা এলিটদের দ্বারা গরিবদের গরিবী হটানো বড় কঠিন কাজ। গরিবের সমস্যা, গরিবের ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ তারাই ভালোভাবে বুঝে থাকে। ধনীরা/এলিটগোষ্ঠি বুঝতে পারে না, অনেক সময় কিছুটা বুঝেও বুঝতে চায় না। তাদেরও একটা স্বার্থ আছে। গরিবের জন্য ধনীরা কি সে স্বার্থ ত্যাগ করবে? এ একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ অবস্থায়, ধনী/এলিটদের দ্বারা প্রণীত আইন-কানুন, পরিকল্পনা, কর্মসূচি, প্রকল্প প্রভৃতি গরিবের গরিবী হটানোর কাজে, তাদের হাতকে শক্তিশালী ও মজবুত করার কাজে কতোটা লাগবে? কেননা, মানুষের 'স্বার্থ' এমনই একটি জিনিস যা তারা কদাচিৎ ত্যাগ করতে পারে। সুতরাং ধনী/এলিটদের স্বার্থ যেখানে বিঘ্নিত হবে, সেখানে তারা মনোযোগী ও কার্যকর হবে না। এটাই স্বাভাবিক। এ জন্য গরিবের স্বার্থ, গরিবের উপকার ও উন্নতি গরিবরাই দেখবে ও বুঝবে। সেজন্য ক্ষমতা ও সম্পদের বলয়ে তাদের প্রবেশাধিকার ও পদচারণা নিশ্চিত করা ছাড়া দারিদ্র বিমোচন হতে পারে না। বিপ্লবাত্মক মনে হলেও এ বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত সরল এবং সকলে স্বীকারও করেন। কিন্তু তা অন্তরে মেনে নেয়া এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উপরের আলোচনায় যে সকল বিষয় গরিবের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় অনভূত হয় তা হচ্ছে :

(ক) গরিবের সম্পদে প্রবেশাধিকার ;
(খ) গরিবের ক্ষমতায় প্রবেশাধিকার ;
(গ) গরিবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রবেশাধিকার ;
(ঘ) গরিবের উৎপাদনশীল কর্মে প্রবেশাধিকার ;
(ঙ) গরিবের সরকারী তথ্য প্রবাহে প্রবেশাধিকার ;
(চ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুযোগে প্রবেশাধিকার ;
(ছ) পরিকল্পনায় ও প্রকল্পে প্রবেশাধিকার।

এটা আইন প্রবর্তন করে কার্যকর করতে হবে। যদি বলা হয় দেশে গণতন্ত্র আছে, গরিবরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এসব ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তার উত্তরে বলা যায় যে, গরিবদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে রয়েছে যে স্থান থেকে তারা কোনদিনই সম্পদে, ক্ষমতায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে না। জাতীয় পরিষদে প্রবেশতো গরিবদের জন্য চাঁদে পৌঁছানোর মতোই একটা ব্যাপার। এমনকি ইউনিয়ন পরিষদেও গরিবরা নির্বাচিত হতে পারে না। সেখানেও বংশীয় মর্যাদার ও টাকার প্রয়োজন হয়। অথচ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে জাতীয় পরিষদ পর্যন্ত গরিবদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে না এবং তাদের দারিদ্রও ঘুচবেনা।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও দারিদ্র বিমোচন

দারিদ্র বিমোচন বা দারিদ্র হটানো কোন সাময়িক ব্যবস্থার দ্বারা কোনদিনই সম্ভবপর হবে না। এ জন্য প্রয়োজন স্থায়ী, সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর ব্যবস্থা। বাংলাদেশে এনজিওগুলো যে কৌশলে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি কার্যকর করছে তাকে টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ বলা হয়। অর্থাৎ তারা সমাজের বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষদের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সুবিধাভোগী সদস্যের মধ্যে ৯৪ শতাংশ বিত্তহীন মহিলা। সরকারী কর্মসূচিতেও টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ এসেছে। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, নিজেরা করি, আশা এবং আরো অনেক এনজিও দেশের বিত্তহীনদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে ১১৩টি বিদেশী এনজিও এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত ১৫০০টি স্থানীয় এনজিও ছিল। ১৯৯৪ সালে ফ্রেব্রুয়ারি পর্যন্ত এনজিও ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওর সংখ্যা ৮১৪টি। এ ছাড়া বি আর ডি বি, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থাও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের কোটিখানেক গরিব মানুষকে দারিদ্রের কুচক্র থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। আরো চার থেকে সাড়ে চার কোটি দরিদ্র মানুষ থাকছে। এদের সকলকে কি এ কর্মসূচির মধ্যে নিয়ে আসা যাবে? অনেকে বলেন নিশ্চয়ই যাবে। যদি এদেরকে উৎপাদনে বসিয়ে দেয়া যায়, তা হলে এদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার পেতে অসুবিধে হবে না। সীমান্তের ওপার থেকে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক-শব্জী না এসে তখন এখান থেকে ঐ সকল পণ্য সীমান্তের ওপারে যাবে। একদিন এখান থেকেই যেতো ; এখন সেখান থেকে আসে। পরিবর্তনটা লক্ষ্য করতে হবে। এদেশের পরিবর্তন হয়েছে নিম্নমুখী। এটাকে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারলে বাজার এ দেশের অনুকূলে আসবে। যেমন-পোশাক শিল্পে এসেছে। হাত আছে, হাতে কাজ নেই, বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি খাটাবার জায়গা নেই। হাতে কাজ দিলে ও বুদ্ধি প্রয়োগের জায়গা দিলে সচ্ছলতা আসবে। বাংলাদেশের মানুষকে বিদেশী মরিচ, আদা, পেয়াজ, রসুন,

ডাল কিনে খেতে হয় চড়া দামে। এ সকল পণ্য এদেশের চাহিদা মেটাতে পারে না। উন্নত জাতের বীজ বপন ও যান্ত্রিক চাষের মাধ্যমে অবশ্যই এ অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। কৃষি খাতকে শুধু ধান-পাট চাষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে চাঙ্গা করা যাবে না। উন্নত জাতের আলু, ডাল, পেয়াজ, রসুন, মরিচ, তৈলবীজ এবং সেই সঙ্গে আম, কলা, পেয়ারা ও অন্যান্য ফল, হাঁস-মুরগী-মৎস্য চাষের এবং গাভী পালনের মাধ্যমে সমগ্র কৃষিখাতকে অধিকতর উন্নত ও বিস্তৃত করার মধ্যে দেশের দারিদ্র বিমোচনের একটা বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এ খাতের উন্নয়ন হলে তা বিভিন্নভাবে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে। যেমন—(১) এ সকল পণ্য উৎপাদনে অধিক শ্রমের প্রয়োজন হবে। সুতরাং দেশে কর্মসংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি পাবে ; (২) এ সকল পণ্য দেশের চাহিদা মেটাতে পারবে এবং তা দরিদ্র মানুষের প্রোটিন, ক্যালরি ও ভিটামিনের চাহিদা পূরণে অবদান রাখবে ; (৩) এ সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে। সুতরাং কৃষিখাতের উন্নতি ও বিস্তৃতি ব্যতিরেকে দারিদ্র বিমোচন সুদূর পরাহত।

এবার শিল্পখাতের বিষয়টি আলোচনা করা যায়। শিল্পখাতের উন্নতি ব্যতিরেকে সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নতি অসম্ভব। অথচ বাংলাদেশ এ খাতটি আজ পর্যন্ত অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে পারেনি। শিল্পখাতের অবদান অর্থনীতিতে এখনও অপেক্ষাকৃত অল্প। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১৯৬৯-৭০ সালে ৭.৭৮%, ১৯৮৬-৮৭ সালে ৮.৮%, ১৯৮৮-৮৯ সালে ৮.৪% এবং ১৯৯০-৯১ সালে ৮.৭৮ শতাংশ ছিল।[৩২] সুতরাং গত দু'দশকে অর্থনীতিতে কাঠামোগত তেমন উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেনি। বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট খাত মিলে ম্যানুফাকচারিং খাতের অবদান ১২ শতাংশের কাছাকাছি এসেছে। সরকারী খাতের শিল্পগুলোর অধিকাংশ রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে। যেগুলো চলন্ত রয়েছে তারও অধিকাংশ ক্রমাগত লোকসান দিয়ে যাচ্ছে।

রপ্তানী ক্ষেত্রে একমাত্র পোশাক শিল্প ও হিমায়িত সামুদ্রিক মৎস্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিছু কিছু অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানী বাড়ছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রচলিত পণ্যের রপ্তানী কমেছে। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১১০৩.৮ কোটি টাকা। এ ঘাটতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৯০-৯১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৫১২৮.০ কোটি (বিবিএস বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯২) টাকায়।

বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সে সঙ্গে দারিদ্র বিমোচন সম্ভবপর হবে না। দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের জন্য প্রয়োজন ভোগ্যপণ্য আমদানি হ্রাস ও দেশজ পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি। ভোগ্যপণ্য যতটা সম্ভব দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ও রপ্তানীভিত্তিক শিল্প স্থাপন। এ জন্য প্রয়োজন (ক) বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যের বাজার খোঁজা ও সৃষ্টি করা ; (খ) যে সকল পণ্যের বাজার

৩২। বিবিএস, পরিসংখ্যান পকেট বুক, ১৯৯৩ পৃ: ১৫৭।

আবিষ্কৃত হবে সে সকল পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; (গ) পণ্যের যথাযথ গুণ ও মান বজায় রাখা। এ জন্য প্রয়োজন হবে দেশে (ক) শিল্প স্থাপন ; (খ) শিল্পোদ্যক্তাদের নানারকম উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান; (গ) বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ; (ঘ) বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ, শিল্প প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্ট করা ও উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি।

এভাবে শিল্পখাতকে রপ্তানীমুখী খাতে পরিণত করতে না পারলে দেশের সমষ্টিক অর্থনীতির উন্নতি অসম্ভব। গরিবদের দ্বারা আত্মকর্ম সংস্থানের যে ব্যবস্থা তাতে পুঁজি কম লাগে ; কিন্তু কর্মসংস্থানের খুবই অল্প সুযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যপক্ষে বৃহদাকার শিল্পে পুঁজি বেশী লাগে ; অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রথমটির সুবিধে হল তা নিম্নবিত্তের মধ্যে ও সারাদেশে ব্যপ্ত করা যায়। দ্বিতীয়টির সুবিধে হল তা অল্প সময়ে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে পারে। সুতরাং সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের সম্ভাবনা কতটুকু তা বিশেষভাবে বিচার্য।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের শিল্পখাতের অগ্রগতি শুধু সমাজের বিত্তবান বা এলিটগোষ্ঠিরই উপকারে আসেনি। এ অগ্রগতিতে সারা দেশের মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে। দরিদ্র মানুষের দারিদ্র বিমোচিত হয়েছে। সুতরাং দারিদ্র বিমোচনের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি অপরিহার্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১। রায়, নীহার রঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৯৮০।

২। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (১৯০৫–১৯৪৭), প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৭৫।

৩। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (আধুনিক যুগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, বাংলা ১৩৮১।

৪। রহিম, আবদুর, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১২০৩–১৫৭৬), অনুবাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা : প্যারাডাইস প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮২।

৫। রহিম, আবদুর, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (১৫৭৬–১৭৫৭), অনুবাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা : প্যারাডাইস প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮২।

৬। বন্দোপাধ্যায়, সুখময়, বাংলার ইতিহাসে দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮–১৫৩৮) তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : শ্রীলক্ষ্মী প্রেস, ১৯৮০।

৭। মজুমদার, রমেশ চন্দ্র ; বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা ; জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৮৭।

৮। ইসলাম, সিরাজুল সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪–১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস (২য় খণ্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা : এশিয়াটিক প্রেস, ১৯৯৩।

9. Banaji, D. R., Slavery in British India, Kitabmahal, Bombay : 1933.

10. Alamgir, M. K. Development Strategy for Bangladesh, Dhaka, Centre for Social Studies (June, 1980).

11. Anand, Sudhir., Inequality and Poverty in Malayasia, London : Oxford University Press (1983)

12. Arens and Beurden., Jhagrapur (Bengali Edition), Nayarhat, Ganoprokashani (1980).

13. Banon, Ian., The World Bank Support for the Alleviation of Poverty, Washington D. C. : The World Bank (1988).

14. CIRDAP STUDY SERIES (No. 77) : Socio-Economic Disabilities and Disadvantages of the Rural Bangladesh, August, 1985, CIRDAP, Chameli House, Dhaka.

15. Chambers, Robert., Rural Development—Putting the Last First, Harlow, Essex : Longman Group (1983).

16. Demery, Lionel and Tony Addison., The Alleviation of Poverty Under Structural Adjustment, Washington D. C. : The World Bank (1987)

17. Hagenaars, A. J. M., The Perception of Poverty, Amstardam : Elsavier Science Publisher.

18. Hossain, Mahabub. Credit for the Rural Poor, Dhaka : The Bangladesh Institute of Development Studies (May, 1985).

19. Hossain, Mahabub., Green Revolution in Bangladesh, Institute of Development Studies (1987).

20. ILO Publication., Poverty and Landlessness in Rural Asia, Geneva : International Labour Office (1980).

21. MacGregor, Susane. The Politics of Poverty—Politics Today, Longman Group Ltd. (1981).

22. Osmani, S. R., Economic Inequality and Group Welfare, London : Published by Oxford University Press (1982).

23. Prasad, Kamta., Planning for Poverty Alleviation, New Delhi : Agricole Publishing Academy (1985).

24. Punt, A. E., Profiles of Poverty in India, Delhi : B. R. Publishing Corporation (1982).

25. Rakshit, G., Poverty and Planning in India, New Delhi : The World Press Private Ltd. (1977).

26. Rao, T. N., War on Poverty, Delhi : Manas Publications (1986).

27. Ray, J. K., A Study of the Grameen Bank of Bangladesh, Dhaka : The University Press Limited, 114, Motijheel C/A (1987).

28. Sen, Amarty., Poverty and Famines, Delhi, Oxford : University Press (1982).

29. Sen, Amartya., The Political Economy of Hunger, BIDS Public Lecture Series, 3-4 January, 1989.

30. Siddiqui, Kamal. The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh, Dhaka, National Institute of Local Government, Dhaka : Bangladesh, 1982.

31. Singh, Ajit Kumar., Agricultural Development and Rural Poverty (1987), New Delhi : Ashish Publishing House.

32. Verma, M. M. Planning For the Poor, Lajpat Nagar IV, New Delhi : Gitanjali Publishing House (1986).

ARTICLES

1. Osmani, S. R., Notes on Some Recent Estimates of Rural Poverty in Bangladesh in Special issue on Poverty in Bangladesh, The Quarterly Journal of BIDS, Vol XVIII, No. 3, Dhaka, 1993.
2. Muhammad Yunus, Planning For the Poor in Alamgir, M. K. & W. Ahmed ed., Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 7, No. IA, pp. 133-139.
3. হোসেন, মোশাররফ, বাংলাদেশের দারিদ্র : প্রাগুক্ত পৃ : ১৪০–১৪৯।
4. Syndicate Paper on Poverty Status in Bangladesh & Planning Strategies for Alleviation of Poverty, Written by Syndicate Group A of 8th Senior Staff Course, BPATC, Savar, Dhaka, 1989.

৫. খান, আকবর আলী, সোনার বাংলা : মিথ ও বাস্তব, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪–১৯৭১), দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৩, পৃ : ৫৮৪–৬০৮।

সরকারী ও বেসরকারী দলিল

১। পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ঢাকা : মে, ১৯৮৩, পৃ : ১০১–১১০।

২। পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ঢাকা : বাংলা সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮৬।

৩। পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দি ফোর্থ–ফাইভ ইয়ার প্লান, ঢাকা : জুন, ১৯৯০।

৪। প্রগতি : শিশু রক্ষা ও উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন (১৯৯০–৯৫) জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, ইউনিসেফ, ঢাকা : ১৯৯২।

5. Perspectives on Children in South Asia : A Statistical Profile, UNICEF, Kathmundu, Nepal, 1992.
6. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of the Planning, Govt. of People's Republic of Bangladesh : Report of The Child Nutritional Status Survey 1989-90, April, 1991.
7. Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, Govt. of People's Republic of Bangladesh : Statistical Pocket Book of Bangladesh, 1993.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় ইসলামের দৃষ্টিভংগী

আবদুন নূর*

ভূমিকা

প্রতিটি রাষ্ট্রে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কর্মচারী ও বিধি-বিধানের একটি সংশ্রয় (Network) সংগঠিত করা প্রয়োজন হয় যা সমষ্টিগতভাবে লোক-প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত। Dwight Waldo লোক-প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন সরকারের অভিপ্রায় বা নীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে।[১] অপর এক লোক-প্রশাসনবিদের মতে, লোক-প্রশাসক বা সরকারী আমলাগণ যা করেন তাই হচ্ছে লোক-প্রশাসন।[২] মোটামুটিভাবে বলা যায়, লোক-প্রশাসন হচ্ছে একটি সুসংগঠিত সরকারী কর্মী বাহিনী যারা নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রণীত নীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এটি হচ্ছে মূলত সরকারী কর্মচারীদের একটি কাঠামোগত কর্ম-প্রক্রিয়া। লোক-প্রশাসন তত্ত্বের একজন প্রাথমিক উদ্যোক্তা Henry Fayol-এর মতে, লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে বুঝার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এর ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীকে অধ্যয়ন করা। তিনি একটি সংগঠনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কর্মকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে : পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, নির্দেশনা প্রদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ।[৩] পরবর্তীকালে বিশিষ্ট লোক-প্রশাসনবিদ Luther Gulick ১৯৩৭ সালে প্রণীত একটি রিপোর্টে প্রশাসন প্রক্রিয়ার ৭টি কর্মকাণ্ডকে তাঁর বিখ্যাত আদ্যক্ষর POSDCORB-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।[৪] তবে Fayol, Gulick, Koontz ও O'Dunnel, Kast ও Rosenweig এবং Stephen P. Robbins প্রমুখ লোক-প্রশাসনবিদদের মতামত পর্যালোচনা করে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াকে প্রধানত চারটি সমন্বিত কর্মকাণ্ডের একটি সমষ্টি বলা যায়। এগুলো হচ্ছে : (১) পরিকল্পনা প্রণয়ন ; (২) সংগঠিতকরণ; (৩) নেতৃত্ব প্রদান; ও (৪) নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহি (সারণি – ১)।

পরম্পরাগতভাবে, 'দক্ষতার' সাথে (Efficiency) এবং যতদূর সম্ভব 'স্বল্পতম ব্যয়ে' (Economy) সরকারের আইন ও নীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নই হচ্ছে লোক-প্রশাসনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।[৫] কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সমাজের বঞ্চিত

অধ্যাপক, লোক-প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

জনগোষ্ঠীর প্রতি অবহেলা, ধনী ও গরীবের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান এবং অব্যাহত সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে, লোক-প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করার ব্যাপারে লোক-প্রশাসকদের নৈতিক মানসিকতা গঠনের উপর ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে।[৬] উল্লেখ্য যে, ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক মদীনার বুকে প্রতিষ্ঠিত (মানব রচিত প্রথম) সাংবিধানিক সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থারও প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজে 'আদল' বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা (আল-কোরআন, ৫৭ : ২৫ ; ১৬ : ৯০)।[৭] আলোচ্য প্রবন্ধে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠার্থে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ার উপরোল্লিখিত ৪টি সমন্বিত কর্মকাণ্ডে ইসলামের দৃষ্টিভংগী তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে। কেননা শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার" (অনুচ্ছেদ ৮(১) (এবং সরকার পরিচালনার ভিত্তি হিসাবে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৮(২))। উপরোক্ত সাংবিধানিক ধারাটি বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক সমাজ গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন, তার আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালিত হবে। H. George Frederickson-এর মতে, কোন দেশের লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ভিত্তি হওয়া উচিত সে দেশের সংবিধান।[৮] অতএব আশা করা যায় যে, এ জাতীয় আলোচনা বাংলাদেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি প্রতিশ্রুতিশীল, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning)

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়াটি শুরু হয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। সংগঠনের লক্ষ্য কি এবং তা কিভাবে অর্জন করা হবে, এ সকল ব্যাপারে আগাম নির্ধারণই হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন। পবিত্র কোরআনে মহান প্রভু আল্লাহ্‌ উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সবই তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ীই ঘটছে (সুরা হাদীদ, ৫৭ : ২২)। এ ছাড়াও মানুষের উদ্দেশ্যে কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে : "নিজ নিজ প্রচেষ্টার বাইরে মানুষের কিছুই প্রাপ্য নেই" (সুরা নজম, ৫৩ : ৩৯), এবং "আল্লাহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয়" (সুরা রা'দ, ১৩ : ১১)। কোরআনের এ সকল আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষকে

সারণি - ১
লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়া

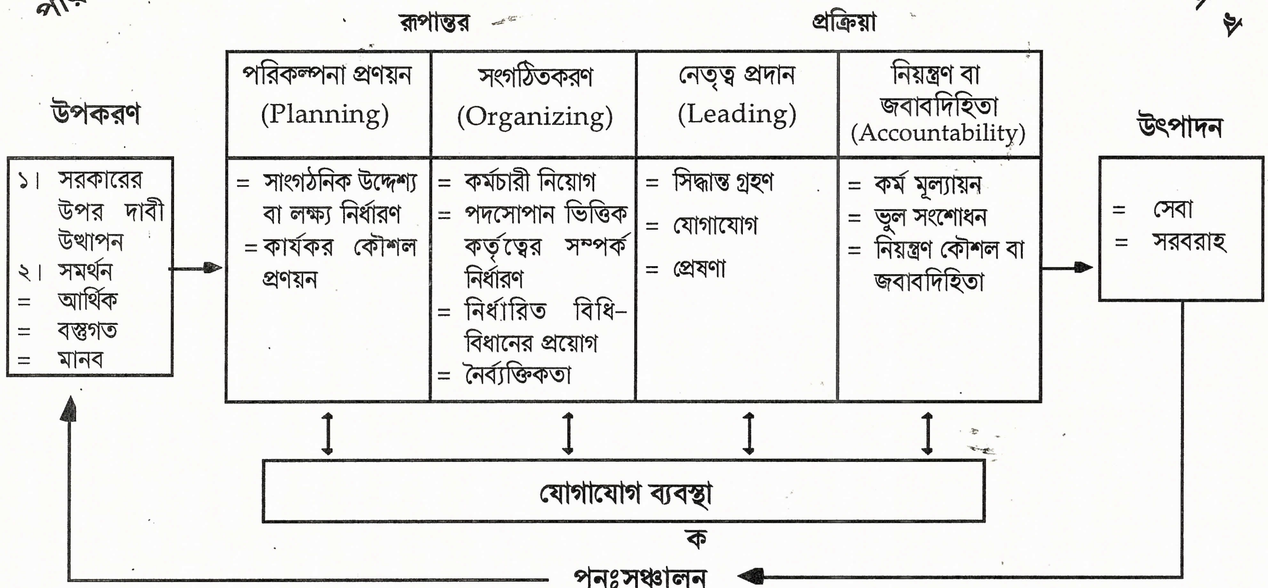

নোট : ক. পুনঃসঞ্চালন পরিবেশের উপর উৎপাদনের প্রভাবকে পর্যালোচনার মাধ্যমে পরবর্তিতে উপকরণকে উপযোগী করে পুনর্গঠিত করে।

খ. পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে (১) মক্কেল, (২) সেবা ও সরবরাহের ব্যয়, (৩) জনগণ ও সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যারা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসকগণ এবং কর্মসূচিগুলোকে সমর্থন প্রদান বা বিরোধিতা প্রদান করে।

উৎস : অভিযোজিত Ira Sharkansky, *"Public Administration : Policy Making in Government Agencies"*, Third Edition (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1975), p. 49 ; Harold K. Koontz, Cyril O' Dunnell and Heinz Weihrich, *Management*, Eighth Edition (Singapore : McGraw-Hill Inc., 1984), p. 228 ; Stephen P. Robbins, *The Administrative Process : Integrating Theory and Practice* (New Delhi : Prentice Hall of India, 1978), p. 55.

উন্নতি লাভ বা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মোদ্যোগী হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করা। মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলছেন :

> "হে বণি আদম !.......বল ! আমার প্রতিপালক নির্দেশ করেছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার" (সুরা আ'রাফ, ৭ : ২৭ – ২৯) ;
>
> "হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা, করলে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে" (সুরা স্যাদ, ৭ : ২৬) ;
>
> "আল্লাহ, তোমাদেরকে নির্দেশ করছেন সকল বিষয়ে 'ন্যায়বিচার' করতে এবং মানুষের 'কল্যাণ' সাধন করতে" (সুরা নাহল, ১৬ : ৯০) ; এবং
>
> "আমি (আল্লাহ্) রসুলদের (পথপ্রদর্শক) প্রেরণ করেছি ন্যায়-নীতির কিতাবসহ (পথনির্দেশিকা) যাতে মানুষ (সমাজে নিজেদের মধ্যে) 'ন্যায়বিচার' কায়েম করে" (সুরা হাদীদ, ৫৭ : ২৫)।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত কর্মসূচি উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আসবে : ক) সমাজে বসবাসকারী সকলের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা) পূরণ ; খ) সমাজ হ'তে দারিদ্র দূরীকরণ ; গ) সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস ; এবং ঘ) উৎপাদনের উপকরণগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।[৯]

ক) একটি কল্যাণকামী সমাজ গঠনের মূল্যবোধের সাথে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রশ্নটি অংগাংগিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণকে ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সমাজে বসবাসকারী সবার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন : "প্রতিটি আদম সন্তানের তিনটি বিষয়ের উপর অধিকার রয়েছে—খাবার জন্য রুটি, থাকার জন্য বাসস্থান, এবং পরার জন্য বস্ত্র" (তিরমিজী)। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপর হাদীসটি হচ্ছে : "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরজ" (ইবনে মাযাহ্)। অতএব, জনগণের এসব মৌলিক চাহিদা যেমন—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা (এবং স্বাস্থ্য ও দাম্পত্য জীবন) অর্থাৎ ইসলামী পরিভাষায় "জরুরতে ছিত্তা" (বা ছয়টি প্রয়োজনীয় বিষয়) পূরণের দায়িত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকারের। মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের দৈহিক পুষ্টি ও মানসিক প্রতিভার বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়। অতঃপর তারা সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

খ) ইসলাম নিম্নোক্ত উপায়ে সমাজ হতে দারিদ্র বিমোচন বা দূরীকরণের নির্দেশ করে :

(১) সমাজের সকল দক্ষ ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ; এবং

(২) সমাজের অক্ষম, রোগী, এতিম, বিধবা, ছিন্নমূল অর্থাৎ যারা কাজ করতে অক্ষম, তাদের জন্য সম্মানজনকভাবে জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা। মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে হযরত (সঃ) বলেছেন : "কেউ নির্ভরশীল পোষ্য রেখে মারা গেলে, নির্ভরশীলদের দায়িত্ব আমাদের" এবং "সমাজে যার কোন অবলম্বন নেই, রাষ্ট্রই (সরকার) তার অবলম্বন" (আবু দাউদ)। এ জাতীয় পুনর্বাসন কর্মসূচির ব্যয়ভার বহনের জন্য ইসলামী বিধানে ধনীদের সম্পদের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে গরীবদের প্রাপ্য হিসাবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন : "ধনীদের সম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে সমাজের গরীব ও বঞ্চিতদের" (সুরা জারিয়াত, ৫১ : ১৯)।

গ) ইসলাম মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া বা করা নিষেধ করে এবং ধনী ও গরীবদের মধ্যে সম্পদ পুনর্বন্টনের আদেশ দেয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন : "তোমাদের মধ্যে শুধু ধনীদের মাঝেই যেন সম্পদ আবর্তিত না হয়" (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)। এ লক্ষ্যে ইসলামে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি বন্টন, ওয়াকফ, যাকাত এবং ছদ্‌কা ইত্যাদির বিধান রয়েছে। বিশিষ্ট উন্নয়ন তত্ত্ববিদ Dudly Seers-এর মতে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে যদি আয়ের কেন্দ্রীভূতিও কমিয়ে আনা যায় তাহলে দারিদ্র দূরীকরণের কাজ অনেক বেশী ত্বরান্বিত হবে।[১০]

ঘ) সর্বশেষে, সমাজের জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও ইসলাম ভূমি, পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) নির্দেশ ছিল, "কারো হাতে পূঁজি থাকলে তা প্রয়োগ করা উচিত, এবং কারো মালিকানাধীন জমি থাকলে তা চাষ করা উচিত"। রসুল (সঃ) বলেছেন, "কেউ জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও একাধিক্রমে তিন বৎসর জমি চাষ না করে পতিত রাখলে, তার জমি বাজেয়াপ্ত হবে।" অনুরূপভাবে, পবিত্র কোরআনেও কারো কাছে পুঁজি থাকলে সেটাকে উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ে খাটানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে (সুরা বাকারা, ২ : ২৭৫)।

উপরোল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ইসলাম রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বনের সুপারিশ করেছে :

(১) একটি পরিস্রাবন পদ্ধতির (Filter mechanism) সাহায্যে সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর এবং বিলাসী দ্রব্যের আমদানী, উৎপাদন ও ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনা ;

(২) সমাজে বসবাসকারী অন্যান্যদের সাথে সম্পদ শেয়ার করে ভোগ করার জন্য একটি প্রেষণা ব্যবস্থা (Motivation system), অর্থাৎ সমাজের স্বার্থে বা মানুষের কল্যাণে সম্পদের কিয়দংশ উৎসর্গ করাকে ইসলাম ধর্মীয় কর্তব্য বা "পুণ্য কর্ম" (Virtuous deed) হিসাবে উৎসাহিত করে (সুরা যারিয়াত, ৫১ : ১৫, ১৯) ; এবং

(৩) জাতীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা (Re-structuring the economy) যাতে একদিকে যেমন মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে সমাজের সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত হতে না পারে এবং অপরদিকে, সমাজে বসবাসকারী সকল সদস্যের মৌলিক প্রয়োজন ও সমাজের চাহিদা নিরুপণের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদের উৎপাদন সম্ভবপর হয়।[১১]

২. সংগঠিতকরণ (Organizing)

আধুনিক লোক-প্রশাসনের মূলে রয়েছে সরকারী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের সংগঠন। ইসলামও আল্লাহ্‌র নির্দেশনা ও রসুলের (সঃ) তরীকা অনুযায়ী সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুসারীদেরকে সংগঠিত হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে (সুরা আল-ইমরান, ৩ : ১০৩)। খলিফা ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন : "কর্তৃত্ব ছাড়া নেতৃত্ব হয় না, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন হয় না এবং সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না।"

একটি যুক্তিযুক্ত সংগঠনের প্রধানত চারটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদান থাকে : (ক) মেধার ভিত্তিতে কর্মচারীদের নিয়োগ ; (খ) পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের বিন্যাস ; (গ) কর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত আইন বা বিধি-বিধান ; এবং (ঘ) নৈর্ব্যক্তিকতা।[১২] এ সকল ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভংগী কী, নিম্নের আলোচনায় তা তুলে ধরা হল।

ক. কর্মচারী নিয়োগ ঃ জাতিসংঘের প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশের লোক-প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র হচ্ছে মেধাভিত্তিক নিয়োগকৃত ও সংগঠিত ক্যারিয়ার সার্ভিসের উপযুক্ততা ও দক্ষতা।[১৩] কেননা সরকারী কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আধুনিক প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের ন্যায় ইসলামও সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র মেধাকেই মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রশাসনিক দায়িত্ব ও ক্ষমতাকে ইসলামী পরিভাষায় আমানত (Trustee) বলা হয়। তাই পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে : "আমানত উহার (উপযুক্ত) মালিককে প্রত্যার্পণ করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করিবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে" (সুরা নিসা, ৪ : ৫৮)। কর্মচারী নিয়োগের সময় উপযুক্ত বা অধিকতর যোগ্য কোন প্রার্থী থাকলে তাকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করা ইসলাম কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন : "যে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কারো বদলে কম যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ করল, সে

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল" (ইবনে তাইমিয়া)। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সিভিল সার্ভেন্টস বা সরকারী আমলাদের মেধা যাচাইয়ের মানদণ্ড কেবল তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত দক্ষতাই নয়, উপরন্তু তাঁদের চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিঃস্বার্থপরতা এবং সর্বোপরি, ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁদের প্রতিশ্রুতিশীলতাও এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে, "মজুর (কর্মচারী) হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে 'শক্তিশালী' এবং 'বিশ্বস্ত' (সূরা কাসাস, ২৮ : ২৬)।" ইসলামী গবেষকদের মতে 'শক্তিশালী' কথাটা সংশ্লিষ্ট পদ/কর্মের জন্য ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার সমার্থক এবং শাসনতান্ত্রিক নীতিমালা বুঝার ও প্রয়োগের ক্ষমতাকে বুঝায়। অপরদিকে, 'বিশ্বস্ত' প্রত্যয়টি আল্লাহ্‌র ভীতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সাংগঠনিক লক্ষ্যের (ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ) প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা অর্থে বুঝান হয়েছে।[১৪] এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, '**এ হ্যাণ্ডবুক অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন**' (১৯৬১) গ্রন্থেও উত্তম সরকারী কর্মচারীদের গুণাবলীর মধ্যে সততা, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫]

ইসলামিক প্রশাসনে রিক্রুটম্যান্ট পলিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এখানে সরকারী পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম কোন পার্থক্য করা হয় না। প্রফেসর মন্টোগোমারী ওয়াট তাঁর সুবিখ্যাত, '**দ্য ম্যাজেস্টি দ্যাট ওয়াজ ইসলাম**' নামক গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলের কথা আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তখন মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, প্রাদেশিক সচিব ও দেশের প্রধান অর্থনিয়ন্ত্রক ইত্যাদিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্যতা অনুযায়ী অমুসলিমদের নিয়োগ করা হয়েছিল।[১৬]

খ. কর্তৃত্বের পদসোপান ঃ সংগঠনে পদসোপান বলতে কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্কেই বুঝায় এবং কর্তৃত্ব হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃক অধঃস্তনকে নির্দেশনা প্রদানের আইনানুগ অধিকার। প্রশাসনিক সংগঠনে নিম্নক্রমিকভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় এবং প্রতিটি অফিসকে ঊর্ধ্বতন অফিসের নিকট দায়ী রাখা হয়। এমনিভাবে বা পিরামিড সদৃশ্য সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে অধিষ্ঠিত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকে।

ইসলামী প্রশাসন তত্ত্বে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য কেবল আনুষ্ঠানিক আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন : "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে মান্য কর, তাঁর রসুলকে মান্য কর এবং মান্য কর তাঁদেরকে যাঁদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে ; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ও রসুলের স্মরণ লও" (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯)। অতএব, ইসলামী প্রশাসনে বিভিন্ন গ্রেডের কর্তৃত্ব স্বীকৃত। ইসলাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আল্লাহ্‌র (কোরআনের) প্রতি এবং রসুলের (সুন্নাহর) প্রতি আনুগত্য

প্রদর্শনের আদেশ করছে, এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম একই সাথে জনগণকেও উপদেশ দেয় রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নেতৃত্বের 'আইনানুগ সিদ্ধান্তকে' মেনে চলতে।[১৭]

গ. নির্ধারিত আইন ঃ যে কোন যুক্তিযুক্ত সংগঠনে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এবং বিমূর্ত নীতি-পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়। সমাজে ন্যায়বিচারের সাথে দ্রব্য ও সেবাসমূহ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রশাসকদের জন্য ইসলাম নির্ধারিত মৌলিক নীতি-নির্দেশিকা হচ্ছে 'শরীয়া' (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯, এবং সুরা হাশর, ৫৯ : ৭, ১০৫)। 'শরীয়া' হচ্ছে মহান প্রভু আল্লাহ্‌র 'কোরআন'; রসুলের 'সুন্নাহ্‌' ও 'ইজ্‌তিহাদ' (নৈতিক বিবেচনা) এর সমষ্টি। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মোয়াজ ইব্‌নে জাবালকে ইয়ামেন প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগের পর মদীনা ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রশাসনের প্রধান হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কিভাবে তিনি (মোয়াজ) প্রদেশটির শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। "কোরআনের পথ নির্দেশনা অনুযায়ী", মোয়াজ জবাবে বলেছিলেন। "কিন্তু তুমি যদি তথায় কোন সমাধান না পাও"? "তাহলে আল্লাহ্‌র রসুলের সুন্নাহ্‌ মোতাবেক।" এবং "সেখানেও যদি কোন সমাধান না মিলে"? "বেশ! সে অবস্থায় আমি নিজের বিবেকবুদ্ধি (বা নৈতিক বিবেচনা) অনুসারে ফয়সালা করব।" এতে রসুল (সঃ) এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি মোয়াজকে বুকে জড়িয়ে প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া চাইলেন।[১৮] এভাবে ইসলামী 'শরীয়া' শাসনতান্ত্রিক মৌল নীতিমালার ন্যায় মানুষের জন্য প্রশাসনিক আইনের একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রদান করে এবং সময় বা এলাকার দাবী অনুযায়ী সবিস্তারের জন্য তাদের উপর স্ববিবেচনার ক্ষমতা প্রদান করে (অবশ্য 'শরীয়া' নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে)।[১৯] চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের ন্যায় আধুনিক যুগের প্রশাসন ব্যবস্থায়ও 'শরীয়ার' প্রয়োগ উপযোগিতার ব্যাপারে S. M. at. Tamawi বর্ণিত একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুসারী হওয়ার কারণে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির কার্যকারিতার ব্যাপারে আস্থাহীন/সন্দেহপ্রবণ আরবের একটি মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য ষাটের দশকের শুরুতে জাতিসংঘের মাধ্যমে সমসাময়িককালের দু'জন লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। Luther Gulick এবং James Pollock নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উক্ত আমেরিকান বিশেষজ্ঞদ্বয় ১৯৬২ সালে প্রদত্ত তাঁদের রিপোর্টে লিখেছেন : "Islamic culture is one of the best bases for a strong and successful government and a strong and efficient bureaucracy in modern times," অর্থাৎ 'ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে আধুনিক সময়ে একটি শক্তিশালী সরকার এবং সুদক্ষ আমলাতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভিত্তি'।[২০] তাঁরা আরও লিখেছেন ঃ "The Shari'ah offers the Egyptians the basic

principles and elements upon which they can erect their new 'democracy' and use their leadership qualities, citizen's involvement in the political life of the country and participation in the administrative machinery, and private and public wealth in the best interest of the nation as a whole," অর্থাৎ 'ইসলামী শরীয়া আইন মিশরীয়দেরকে তাদের নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা প্রদান এবং জাতির সার্বিক স্বার্থে নেতৃত্বের গুণাবলীর যথাযথ ব্যবহার ও দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রশাসন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে'।[২১]

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এই সাক্ষ্য শুধু মিশর নয় অপরাপর সকল মুসলিম দেশের কর্মকর্তাদেরকে নিজস্ব সংস্কৃতি , ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিক আচরণের উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ দেশের নয়া প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে।[২২]

ঘ. নৈর্ব্যক্তিকতা ঃ যে কোন যুক্তিযুক্ত সংগঠনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার নৈর্ব্যক্তিকতা। আমলাতন্ত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা হচ্ছে এর বস্তুনিষ্ঠতা এবং নির্ধারিত বিধান বা নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কারো খেয়াল, ইচ্ছা বা পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে নয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, সরকারী আমলা/কর্মচারীগণ নির্ধারিত বিধান বা আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। কারো প্রতি ব্যক্তিগত প্রীতি বা বিদ্বেষ পরিহার করার জন্য তাদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আদেশ করছেন :

"হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সত্য সাক্ষ্য দাও, এমনকি তা যদি তোমার নিজের প্রিয়জনদের বা পিতামাতার বিরুদ্ধেও যায়। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে কামনার অনুগামী হইও না। তোমরা যাহাই করো না কেন, আল্লাহ সবকিছুরই খবর রাখেন"(সুরা নিসা, ৪ : ১৩৫) ;

"কারো প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার হতে বিচ্যুত না করে। ন্যায়বিচার কর, কেননা এটাই আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর" (সুরা মাঈদা, ৫ : ৮) ; এবং

"তোমরা ন্যায়সংগতভাবে পরিমাপ করবে এবং লোকদিগকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না" (সুরা হুদ, ১১ : ৮৫)।

ইসলামী সমাজে সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে দ্রব্য ও সেবা–সামগ্রী সরবরাহকরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি ও মূল্যবোধ কঠোরভাবে মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা যুক্তিযুক্ত আমলাতন্ত্রের (Rational bureaucracy) সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত প্রশাসনিক

নৈর্ব্যক্তিকতার কথা ইসলাম বলেছে সেই সপ্তম শতকে। ইসলাম শুধু নৈর্ব্যক্তিকতার কথাই বলেনি, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলে মদীনা রাষ্ট্রে তার পূর্ণ বিকাশ, প্রকাশ এবং বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল।

৩. নেতৃত্ব প্রদান (Leading)

প্রত্যাশিত বা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের/প্রভাবিতকরণের একটি সফল প্রক্রিয়া হচ্ছে নেতৃত্ব। লোক-প্রশাসন সাহিত্যে নেতৃত্বের যে কয়টি ধরণ (Style) রয়েছে সেগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) স্বৈরতান্ত্রিক (Autocratic) ; (২) গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক (Democratic) এবং (৩) অবাধ নেতৃত্ব (Laissez faire)।[২৩] লোক-প্রশাসন পণ্ডিতদের প্রায় সবাই গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের কাম্যতা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে সাংগঠনিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসারীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকে এবং ধারণা করা হয় যে, এতে কর্মচারীরা সংগঠনের প্রতি একাত্মবোধ করে এবং সিদ্ধান্ত/কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের একাগ্রতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম আল্লাহ্ ও রসুলের পর সমাজের বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকা এবং কর্তৃপক্ষের ন্যায়সংগত/আইনানুগ সকল সিদ্ধান্তকে মেনে চলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় (আল-কোরআন, ৪ : ৫৯)। অপরদিকে, প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের প্রতি ও অনুসারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন : "ওয়া আমরুহুম শূ'রা বাইনাহুম" অর্থাৎ, '(তোমরা) নিজেদের মধ্যে কার্য সম্পাদন কর আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে/ ভিত্তিতে', (সুরা শুরা, ৪২ : ৩৮, আরও দেখুন সুরা আল-ইমারান, ৩ : ১৫৯)। ইতিহাসে এ ব্যাপারে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে মহানবী (সঃ) এবং চার খলিফা গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বদা তাঁদের সংগীদের সাথে আলোচনা-পরামর্শ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামরিক বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সাথেও পরামর্শ করার নজির রয়েছে তাঁদের শাসনামলে।

৪. নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহি (Accountability)

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বা সর্বশেষ পর্যায়টি হল মূল্যায়ন বা জবাবদিহি। নিয়ন্ত্রণ বা দায়িত্বশীলতা হিসাবেও এটিকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র সরকারী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এটাই প্রত্যাশিত। প্রশাসনিক কর্মে আমলাদেরকে আচরণের নৈতিক মানও বজায় রাখতে হয়। সরকারী আমলাতন্ত্রের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যাপারে লোক-প্রশাসন সাহিত্যে দু'টি তত্ত্ব

প্রচলিত আছে : (ক) পদসোপানিক তত্ত্ব ; এবং (খ) যুক্তিযুক্ততার তত্ত্ব (Peter Self)।[২৪]

পদসোপানিক তত্ত্ব মতে, আমলাতন্ত্রকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা জবাবদিহি রাখার জন্য কতগুলো প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন।[২৫] এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আইন সভায় প্রশ্নোত্তর, বাজেট অনুমোদন এবং সংসদীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা ইত্যাদি। কিন্তু উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মন্ত্রি পরিষদের সমষ্টিগত জবাবদিহির (Collective responsibility) আড়ালে এবং প্রশাসকদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার (Political neutrality) ও বেনামীর (Anonymity) ছদ্মাবরণে, সরকারী আমলাগণ জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে সক্ষম হন। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরিভাবে জনগণের কাছে সরকারী আমলাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় না। অপরদিকে, শেষোক্ত তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি বা নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমনভাবে প্রেষণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে তাঁরা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও যুক্তিযুক্ততার প্রতি আগ্রহশীল/শ্রদ্ধাশীল হন। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে আধুনিক চীন ও ইউরোপের সুইজারল্যান্ড। Farrel Heady তাঁর তুলনামূলক লোক-প্রশাসন সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, সুইজারল্যান্ডের আমলাগণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসূচির মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত বলে সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি অধিকতর সচেতন। অপরদিকে, চাইনিজ সরকারী কর্মকর্তারা কন্‌ফুসিয়ান দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে জনগণের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় সদাচরণের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী।[২৬] এর বিপরীতে, বাংলাদেশের সরকারী আমলাগণ কোন নৈতিক দর্শন বা অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত নন বলে তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা ১৯৮৭ সালের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে বলে সরকারী প্রতিবেদনে বেশ উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭] অতএব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, সরকারী আমলাদের কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য পদসোপান তত্ত্ব ও যুক্তি-যুক্ততা তত্ত্বের যৌথ প্রয়োগ অপরিহার্য।

ইসলামী প্রশাসনে জবাবদিহির ব্যবস্থায় উপরের উভয় তত্ত্বের একটি অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী প্রশাসনে জবাবদিহি ব্যবস্থা ত্রি-মাত্রিক : (১) প্রশাসনিক পদসোপান ভিত্তিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট (কার্যবিবরণী প্রেরণ এবং অধঃস্তনের কার্যকলাপ পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে) জবাবদিহি করা ; (২) সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা ('মাজালিম' এর মাধ্যমে সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও প্রতিকার বিধান ছাড়াও সরকারী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতি শুক্রবার জুমার

খোৎবা এবং বার্ষিক হজ্বের সম্মেলনে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও উত্তরদান ব্যবস্থার মাধ্যমে) ; এবং (৩) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করার চেতনা সমুন্নত রাখার মাধ্যমে (সুরা বাকারা, ২ : ২০৩, ২৮১ ; সুরা নিসা, ৪ : ৮৭)।[২৮] জনগণের অবস্থা পরিদর্শনকালে ইসলামী প্রশাসনের প্রধান হিসাবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার বলেছিলেন : "সুদূর তাইগ্রীস নদীর তীরে কোন কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায়, তা'হলে আল্লাহ্‌র দোহাই, ওমরকে তার জন্য শেষ বিচারের দিন (আল্লাহ্‌র কাছে) জবাবদিহি করতে হবে।" এ জাতীয় চেতনাই সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন প্রশাসকের মনে অহর্নিশ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণে ব্রতী হবার তাগিদ সৃষ্টি করে।

উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনের সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা নিম্নের সারণীদ্বয়ে তুলে ধরা হল:

সারণি - ২

আধুনিক লোক-প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা

লোক-প্রশাসন প্রক্রিয়া	আধুনিক লোক-প্রশাসন (লক্ষ্য ও দৃষ্টিভংগী)	ইসলামী প্রশাসন (লক্ষ্য ও দৃষ্টিভংগী)
১। পরিকল্পনা প্রণয়ন	উৎপাদন ও বিতরণ কর্মে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা	ন্যায়বিচার ও কল্যাণ
২। কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ ক) নিয়োগ	ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতা।
খ) পদসোপান	খ) পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য	খ) আল্লাহ্ রসূল (সঃ) ও বৈধভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের প্রতি আনুগত্য।
গ) বিধিমালা	গ) স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত বিধিমালা	গ) আল্লাহ্‌র কোরআন, রসূলের (সাঃ) সুন্নাহ ও নৈতিক বিবেচনা।
ঘ) নৈর্ব্যক্তিকতা	ঘ) মূল্য নিরপেক্ষ বিধিমালা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।	ঘ) কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।
৩। নেতৃত্ব	**অবস্থা বা ঘটনাচক্রজাত**	**'শুরা' বা অংশগ্রহণমূলক**
৪। জবাবদিহি	পদসোপান ভিত্তিক বা আনুষ্ঠানিক	ক) পদসোপান ভিত্তিক ; খ) সরাসরি জনগণের নিকট ; গ) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার প্রতি জবাবদিহির চেতনা বা নৈতিকতাবোধ।

সারণি - ৩
আধুনিক লোক-প্রশাসন ও ইসলামী প্রশাসনে
আমলাতন্ত্রের বিশ্ব দর্শন

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	আধুনিক লোক-প্রশাসন	ইসলামী প্রশাসন
১।	আমি কে?	ক্ষমতার/সরকারের প্রতিনিধি	পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীয় সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক 'সার্বভৌম আল্লাহ্‌র খলীফা' বা প্রতিনিধি।
২।	আমার কি করণীয়?	সরকারী কর্মে নির্ধারিত বিধি-বিধানের প্রয়োগ	আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ সাধন।
৩।	প্রশাসনের লক্ষ্য কি?	দক্ষতা ও স্বল্প ব্যয়ে সরকারী নীতির বাস্তবায়ন	সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণ।
৪।	আমার আনুগত্য কার প্রতি?	ক্ষমতা/সংগঠন/পেশাগত দলের প্রতি	আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল (সঃ) ও বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারীর প্রতি।
৫।	প্রশাসনিক নেতৃত্বের স্বরূপ কি?	অভিভাবকসুলভ (যেখানে সরকারী আমলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং জনগণ আইন পালন করবে)	গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে।
৬।	আমলারা কর্মজীবনে কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়?	ব্যক্তি/শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বারা	ক) মানব কল্যাণার্থে সৎকর্ম সৃষ্টি ও অসৎকর্ম প্রতিরোধে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন। খ) পার্থিব কর্মের জন্য শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার চেতনা ; এবং গ) সৎকর্মের জন্য পরকালে বেহেশ্‌ত এবং অসৎকর্মের জন্য দোজখের শাস্তির ব্যাপার আল্লাহ্‌র হুঁশিয়ারী।

উৎস : Anthony Downs, *Inside Bureaucracy* (Boston : Little Brown and Company, 1969) ; Robert D. Miewald, *Public Administration : A Critical Perspective* (New York : McGraw Hill, 1978); Yaser M. Adwan and Zahir Kayed, "The Responsiveness of Government Officials to Public Demands : A Comparative Study'', *Asian Affairs 10* (April-June, 1988) ; এবং আবদুন নূর , "আমলাতন্ত্রের বিশ্ব দর্শন" ***মানব উন্নয়ন জার্নাল***, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪, ১৯৯১, পৃ : ৪৩ ও ৪৫।

উপসংহার

লোক-প্রশাসন হচ্ছে সরকারের ইচ্ছা বা নীতিসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের একটি কাঠামোগত কর্মপ্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া প্রধানত চারটি সমন্বিত কর্মকাণ্ডের সমষ্টি : (১) পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রশাসন কর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ ; (২) পরিকল্পনা কার্যকরণের জন্য উপযুক্ত কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ ; (৩) কর্মসূচি

কার্যকরণের জন্য কর্মচারীদেরকে পরিচালনা বা নেতৃত্ব প্রদান ; এবং (৪) কর্মচারীদেরকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহিকরণের ব্যবস্থা।

পরম্পরাগতভাবে, 'দক্ষতার' সাথে এবং যতদূর সম্ভব 'স্বল্পতম ব্যয়ে' সরকারের আইন ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নই ছিল লোক-প্রশাসনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি অবহেলা, ধনী ও গরীবের ব্যবধান এবং অব্যাহত সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে, 'দক্ষতা' ও 'মিতব্যয়িতার' সাথে সাথে, প্রশাসনের মাধ্যমে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করার উপর ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত "নব লোক-প্রশাসন" আন্দোলন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। উল্লেখ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক মদীনার বুকে প্রতিষ্ঠিত (মানব রচিত প্রথম) সাংবিধানিক সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থারও প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজে 'আদ্‌ল' বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে : (ক) সমাজে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ ; (খ) সমাজ হতে দারিদ্র দূরীকরণ ; (গ) উৎপাদনের উপকরণসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ; এবং (ঘ) সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন ও পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস।

উপরোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য লোক-প্রশাসন অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী সংগঠনে লোক নিয়োগের ভিত্তি হবে মেধা। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সরকারী আমলাদের মেধা যাঁচাইয়ের মানদণ্ড কেবল তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত দক্ষতার উপর সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু, তাদের চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সর্বোপরি, ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতাও বিবেচ্য বিষয়। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় আল্লাহ, রসুল (সঃ) ও বৈধভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—এই তিন স্তরবিশিষ্ট কর্তৃত্ব কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। সমাজে ন্যায়বিচারের সাথে দ্রব্য ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কারো প্রতি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অনুরাগ বা বিরাগ নয়, বরং সরকারী আমলাদের জন্য ইসলাম নির্ধারিত মৌলিক পথ নির্দেশিকা হচ্ছে, মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বিশ্বজনীন নীতি ও রসুল (সঃ)-এর সুন্নাহ্ এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইজ্‌তিহাদ (নৈতিক বিবেচনা)।

ইসলামী প্রশাসনে নেতৃত্ব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ। আধুনিক লোক-প্রশাসনে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা জবাবদিহি করার জন্য শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও বেনামীর ছদ্মাবরণে আধুনিক ব্যবস্থায় সরকারী আমলাদেরকে সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহি করা সম্ভবপর হয় না। অপরদিকে, ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রশাসকদের

জন্য জবাবদিহির ব্যবস্থা ত্রি-মাত্রিক : (ক) প্রশাসনিক পদসোপান ভিত্তিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি থাকা ; (খ) সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করা ('মাজালিম'-এর মাধ্যমে প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগের প্রতিকার করা ছাড়াও সরকারী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার জুমা'র খোৎবা এবং বার্ষিক হজ্বের সম্মেলনে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ ও উত্তরদান ব্যবস্থার মাধ্যমে) ; এবং (গ) শেষ বিচারের দিন স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করার চেতনা মনে জাগরূক রাখার মাধ্যমে। ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার উপরোক্ত নীতিমালা শুধু তত্ত্বই নয়, এসবের পূর্ণ বিকাশ, প্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটেছিল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফা'য়ে রা'শেদীনের শাসনামলে সপ্তম শতাব্দীর মদীনা রাষ্ট্রের লোক-প্রশাসন ব্যবস্থায়।

তথ্য নির্দেশিকা

[1] Dwight Waldo, "The Study of Public Administration" in Richard J. Stillman (ed.), *Public Administration : Concepts and Cases*, Second Edition (Boston : Houghton Mifflin Company, 1780), p. 4.

[2] Gerald E. Caiden, *The Dynamics of Public Administration* (New York : Holt Rinehart and Winston, 1971), p. vii.

[3] Henri Fayol, *General and Industrial Management*, Constance Storrs translated (London : Pitman, 1949), pp, 43-107.

[4] Luther Gulick and L. Urwick (eds.), *Papers on the Science of Administration* (New York : Institute of Public Administration, 1937), p. 13.

[5] ঐ, পৃ : ১৯২।

[6] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : Frank Marini (ed.), *Towards A New Public Administration : A Minnowbrook Perspective* (Seranton : Chandler Publishing Company, 1972)। এ ছাড়াও জাতিসংঘের লোক-প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক সমাজে লোক-প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 'জনস্বার্থ সংরক্ষণ' বা জনগণের কল্যাণ সাধন করা। দেখুন United Nations, *A Handbook of Public Adminstration*, বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ শামসুর রহমান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ: ১৬, ১৮ ও ২৪। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে 'জনস্বার্থের' ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা নিয়ে। 'জনস্বার্থের' দার্শনিক ভিত্তি বা কর্মকাঠামো কি হবে? বিশিষ্ট লোক-প্রশাসনবিদ D. K. Hart ১৯৭৪ সালে *Public Administration Review*-তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, জনস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লোক-প্রশাসন কর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত John Rawls কর্তৃক প্রবর্তিত "সামাজিক ন্যায়বিচারের" নীতিমালা, যেখানে ন্যায়বিচারকে সাম্য, স্বাধীনতা এবং সাধারণ সুবিধার্থে অবদান ভিত্তিক বিনিময়/পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে একটি জটিল মিশ্রণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন D. K. Hart, "Social Equity, Justice, and the Equitable Administration, *Public Administration Review* 34 (1970), pp. 3-10.

[7] ইসলামী প্রশাসনের মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন *A Classic Administrative Policy Letter of Hazrat Ali (RA)*, Department of Forms and Stationeries, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1976.

[8] H. George Frederickson, "Towards A Theory of the Public for Public Administration", *Administration and Society* 22 (1991), p. 408.

[9] ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের *Social Justice in Bangladesh : An Islamic Perspective* (Chittagong : Liberty Forum, 1991) ; এবং "Outlining Social Justice From Comparative Perspective : An Exploration", বিগত ১৯ ও ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইংরেজী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ***বাংলাদেশ ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস***-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

[10] Dudley Seers, "The Meaning of Development": *International Development Review*, Vol. II, No. 4, 1964.

11 ডঃ এম, ওমর চাপড়া, "নতুন অর্থ ব্যবস্থার সন্ধানে" *ইসলামী ব্যাংকিং*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী।

12 Peter M. Blau and Marshall W. Meyer, *Bureaucracy in Modern Society* (New York : Random House, 1971). pp. 8-9.

13 United Nations, *A Handbook of Public Administration,* 1961, p. 34.

14 দেখুন Ibnower Mohammed Sharfuddin, "Towards An Islamic Administrative Theory", *American Journal of Islamic Social Science,* Vol . 4, December, 1987, p. 233.

15 জাতিসংঘ, *এ হ্যান্ডবুক অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন,* মোহাম্মদ শামসুর রহমান অনুদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ : ৫০।

16 বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Montgomery Watt, *The Majesty That Was Islam* (London : Sidgwick and Jackson Ltd., 1974), pp. 44-54.

17 Muhammad Al-Buraey, *Administrative Development : An Islamic Perspective* (London : KPI, 1985), p. 359.

18 Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (London : Christopher, 1961), p. 183.

19 Muhammad Al-Buraey, *op. cit.,* p. 239.

20 Luther Gulick and James Pollock, "The Organization of Governmet Administration of the United Arab Republic (Egypt)", quoted by Sulaiman M. at-Tamawi, *Umar Ibn al-Khattab Wa usul as - Siyasah wal Idarah* (Cairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1969), pp. 10-11.

21 *ঐ।*

22 Al-Buraey, *op. cit.,* pp. 239-240.

23 Felix A. Nigro and Lioyd G. Nigro, *Modern Public Administration* (New York : Harper and Row Publishers, 1980), p. 271.

24 Peter Self, *Administrative Theories and Politics : An Inquiry into the Structure and Process of Modern Government* (London : George Allen And Unwin Ltd., 1975), p. 229.

25 Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy : A Comparative Perspective* (New York : Longman, 1978), p. 20-21. একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় লোক-প্রশাসনকে জবাবদিহি করার প্রাতিষ্ঠানিক বিধি ব্যবস্থার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Abunasar Shamsul

Hoq, *Administrative Reform in Pakistan* (Dacca : National Institute of Public Administration, 1970), pp. 267-288; Ali Ahmed, *Basic Principles and Pactices of Administrative Organization : Bangladesh* (Dacca : NILG, 1981), pp. 170-195.

26 Farrel Heady, *Public Administration : A Comparative Perspective*, 3r ed. (New York : Marcel Dekker, Inc., 1984), p. 66.

27 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন বাৎসরিক প্রতিবেদন*, ১৯৮৮, সারণী ৬, পৃ : ২১।

28 বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ *Social Justice Through Public Administration : An Islamic Perspective.*

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মানবীয় দিক

মোঃ সিরাজুল ইসলাম*

ভূমিকা

সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সংগঠনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা মূলত সংগঠনে শৃঙ্খলা বজায়, সংগঠনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ দমনে সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিধিসমূহ প্রণিধানযোগ্য ঃ

* সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ ;
* সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ ;
* সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা (পাংচুয়াল এটেনড্যান্স) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ ;
* সরকারী কর্মচারী (স্পেশাল প্রভিশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৯ ;
* সরকারী কর্মচারী (ডিসমিজাল অন্ কনভিকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫।

এ উপ-মহাদেশে বৃটিশ শাসনামল থেকেই শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা চালু ছিল। ১৯৭৬ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে "সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৭৬" কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ১৯৩০ সালের সিভিল সার্ভিসেস (ক্লাসিফিকেশন, কন্ট্রোল এবং আপীল) বিধিমালা ; ১৯৩৬ সালের বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা; তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী কর্মচারী (দক্ষতা ও শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ১৯৬০ ; প্রাদেশিক সরকারের সরকারী কর্মচারী (দক্ষতা ও শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ১৯৬০ বহাল ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৬ সালের "সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালাটি বাতিল করে ১৯৮৪ সালে "সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৪ জারী করা হয়। এ বিধিমালাটিও পরবর্তীতে বাতিল করে ১৯৮৫ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে বর্তমান " সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ জারী করা হয়। কিছু সংশোধনীসহ এ বিধিমালাটি বর্তমানে বহাল রয়েছে।

সরকারের শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে উপর্যুক্ত বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনই যথেষ্ট নয়। আইন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা অর্জন সংগঠনে আইনের নির্ভুল প্রয়োগে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু আইনের এহেন প্রয়োগ সংগঠনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, সার্বিক সাংগঠনিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণ

---

* উপ-পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা -১৩৪৩।

ও মন-মানসিকতায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কিরূপ প্রভাব ফেলবে তা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করে না। কখনো কখনো সাংগঠনিক লক্ষ্য অপেক্ষা আইন প্রয়োগই মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। এ অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মী ব্যবস্থাপকের সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন সম্পর্কে ধারণা লাভ ছাড়াও আইনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা বাঞ্ছনীয়। অন্য কথায় কেন শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার উদ্ভব ঘটেছে, কিভাবে উদ্ভব ঘটেছে, কখন কোন্ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়, আইন প্রয়োগ ছাড়াও অন্য কোন বিকল্প পন্থা রয়েছে কিনা তা গভীরভাবে ভেবে দেখা বাঞ্ছনীয়। তাই এ প্রবন্ধে কর্মী ব্যবস্থাপকদের শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক মান উন্নয়নে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধারণা সংশ্লিষ্ট আইনের সঠিক প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্যাবলী

* কর্মী ব্যবস্থাপককে শৃঙ্খলা আইনের সংকীর্ণ ও কারিগরি প্রয়োগে নিরুৎসাহিত করা ;
* শৃঙ্খলা আইন ছাড়াও কর্মী ব্যবস্থাপককে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মানবীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া ;
* শৃঙ্খলা আইনের লাগসই প্রয়োগে কর্মী ব্যবস্থাপককে উদ্বুদ্ধ করা ; এবং
* সরকারের শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

প্রবন্ধ প্রণয়ন পদ্ধতি

প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্তাদি মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ তথ্য সংগ্রহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমকালিন গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংযোজনী ক-এ একটি তথ্যপঞ্জি সন্নিবেশিত হ'ল।

এ প্রবন্ধে শৃঙ্খলা আইনের বিশ্লেষণ করা হয়নি। প্রচলিত শৃঙ্খলা আইনে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সে সম্পর্কে একটি আলাদা প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। এ প্রবন্ধে শুধু সুশীল প্রশাসনে (Civil Service) শৃঙ্খলা আইনের লাগসই প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে কর্মী ব্যবস্থাপকদের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য, সম্ভাব্য বিকল্প পন্থা, অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আচরণ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এবং মৌলিক সার্বভৌম ও চিরন্তন নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটলেও বহু পূর্ব থেকেই অনানুষ্ঠানিক ও বিক্ষিপ্তভাবে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার নজীর পাওয়া যায়। প্রায় ৬০০০ বছর আগে মিসরীয় পিরামিড এবং নীল নদ সংলগ্ন সেচ প্রকল্প নির্মাণে নিয়োজিত দাস-শ্রমিকদের কর্ম সম্পাদনে ও আচরণ নিয়ন্ত্রণে শারীরিক নির্যাতন ও বল প্রয়োগ করা হত। ব্যাবিলনীয় সম্রাট হাম্মুরাবীর (২১২৩-২০৮১ খ্রীঃ পূঃ) আইন কোষেও আচরণ নিয়ন্ত্রণে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এ মর্মে ড্যানিয়েল রেন উল্লেখ করেন, ...Hammurabi issued a unique code of 282 laws which governed business dealings, personal behavior, interpersonal relations, wages, punishments, and a host of other societal matters. চৈনিক ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ের সম্রাটরা রাষ্ট্র পরিচালনায় উপদেষ্টাদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। উপদেশ অমান্যকারীদের কখনো কখনো নির্বাসনে পাঠানো হত। এ মর্মে ফ্রেড লুথান্স উল্লেখ করেন, ...when a young emperor named Tai Chai (1753-1721 B.C.) repeatedly ignored the advice of his advisers, the prime minister had him deposed for a period of 3 years.[2]

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা মূলত নির্যাতন ও শাস্তিমূলক ছিল। কিন্তু সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবে উৎপাদন ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণ, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, বিপণন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে শ্রমিক-মালিক/ব্যবস্থাপক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। কর্মী ব্যবস্থাপনা এবং শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা জটিল রূপ ধারণ করে। কৃষি খাত থেকে আগত শিল্প শ্রমিকদের কৃষি-ভিত্তিক আচরণ (বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অভ্যাস, ইত্যাদি) কারখানার শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। যখন ইচ্ছা তখন কারখানায় আসা এবং কারখানা ত্যাগ করা (স্বাধীন চলার নীতি), সাপ্তাহিক ভোজন অনুষ্ঠানের দিনে কারখানায় অনুপস্থিত থাকা, সপ্তাহে ৩-৪ দিন কাজ করে সপ্তাহের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হলে বাকী দিনগুলোতে কারখানায় না যাওয়া ইত্যাদি কৃষি ভিত্তিক আচরণসমূহ তাঁরা অনুসরণ করতে থাকেন। এ মর্মে ড্যানিয়েল রেন উল্লেখ করেন, ... worker attendance was irregular, "feast days" which were common traditions in the domestic system caused large-scale absenteeism for factory operators, and workers tended to work in spurts by laboring long hours, collecting their money, and then disappearing for countless days of dissipation.[3]

তৎকালে কারখানায় হাজিরার গুণগত মান সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী উল্লেখ করেছেন যে, "If a person can get sufficient (income) in four days to

support himself for seven days, he will keep holiday the other three ; that is, he will live in riot and debauchery."[4]

কারখানার অনিয়মিত হাজিরা ছাড়াও শ্রমিকরা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। কৃষি খাত থেকে শিল্প খাতে অভিগমনের ফলে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কল-কারখানার কঠোর নিয়ম-কানুন ও সুপারভাইজারের নির্দেশ প্রতিপালন, সময়মত কারখানায় হাজির হওয়া ইত্যাদি শিল্প কৃষ্টি (industrial culture) তাঁদের মনে মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ছাড়া কারিগরী জীবন ব্যবস্থা, কারিগরী কর্ম-প্রকৃতি ও পদ্ধতি, সুপারভাইজার ও মালিকদের স্বৈরাচারী আচরণ, নিম্ন বেতন, নিম্নমানের কর্ম পরিবেশ, বরখাস্ত ও চাকরিচ্যুতি ইত্যাদিও তাদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে তাঁরা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তাঁরা কারখানা ও কারখানার যন্ত্রপাতি ভাঙ্গচুর করে, মালিক ও সুপারভাইজারদের মারধর করে, এমনকি মালিকদের ব্যক্তিগত ঘর-বাড়ী ও আসবাব-পত্রও তছনছ ও ভাঙ্গচুর করে। তৎকালে সংঘটিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নজির নিম্নে উপস্থাপিত হল ঃ

" In 1753, John Kay's flying shuttle and other inventions were smashed and his home destroyed by workers protesting the introduction of this labor saving machinery. James Hargreaves suffered a similar fate at his Blackburn mill in 1768."[5]

শিল্প বিপ্লবের সময় এহেন অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও কিছু কিছু ইতিবাচক কার্যক্রমও (যেমন ঃ প্রণোদনা, উপদেশনা, নৈতিকতা উন্নয়ন এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রম) গ্রহণ করেছিলেন (চিত্র-১)।

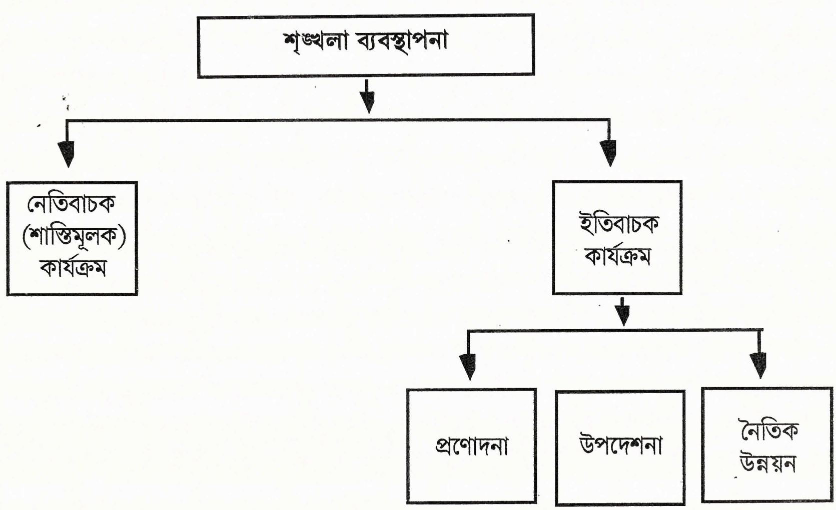

চিত্র—১। শৃংখলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।

support himself for seven days, he will keep holiday the other three ; that is, he will live in riot and debauchery."[4]

কারখানার অনিয়মিত হাজিরা ছাড়াও শ্রমিকরা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। কৃষি খাত থেকে শিল্প খাতে অভিগমনের ফলে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কল-কারখানার কঠোর নিয়ম-কানুন ও সুপারভাইজারের নির্দেশ প্রতিপালন, সময়মত কারখানায় হাজির হওয়া ইত্যাদি শিল্প কৃষ্টি (industrial culture) তাঁদের মনে মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ছাড়া কারিগরী জীবন ব্যবস্থা, কারিগরী কর্ম-প্রকৃতি ও পদ্ধতি, সুপারভাইজার ও মালিকদের স্বৈরাচারী আচরণ, নিম্ন বেতন, নিম্নমানের কর্ম পরিবেশ, বরখাস্ত ও চাকরিচ্যুতি ইত্যাদিও তাদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে তাঁরা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তাঁরা কারখানা ও কারখানার যন্ত্রপাতি ভাঙ্গচুর করে, মালিক ও সুপারভাইজারদের মারধর করে, এমনকি মালিকদের ব্যক্তিগত ঘর-বাড়ী ও আসবাব-পত্রও তছনছ ও ভাঙ্গচুর করে। তৎকালে সংঘটিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নজির নিম্নে উপস্থাপিত হল ঃ

" In 1753, John Kay's flying shuttle and other inventions were smashed and his home destroyed by workers protesting the introduction of this labor saving machinery. James Hargreaves suffered a similar fate at his Blackburn mill in 1768."[5]

শিল্প বিপ্লবের সময় এহেন অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও কিছু কিছু ইতিবাচক কার্যক্রমও (যেমন ঃ প্রণোদনা, উপদেশনা, নৈতিকতা উন্নয়ন এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রম) গ্রহণ করেছিলেন (চিত্র-১)।

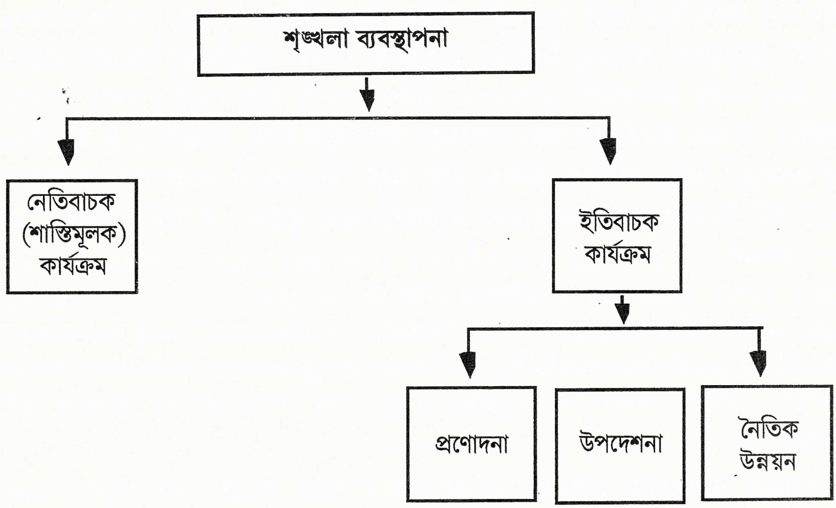

চিত্র—১। শৃংখলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।

কখন কোন্ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা মালিক এবং ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রমিকের দক্ষতার মানের উপর নির্ভরশীল ছিল। কোন কোন মালিক শ্রমিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, আবার কোন কোন মালিক প্রণোদনা, উপদেশনা, নৈতিকতা উন্নয়ন এবং/অথবা কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। দক্ষ শ্রমিকদের চেয়ে অদক্ষ ও শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। যেহেতু তখন দক্ষ শ্রমিকের অভাব ছিল সেহেতু মালিকরা দক্ষ শ্রমিকের বেলায় কঠোর মনোভাব পোষণ করতে পারতেন না। শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় শিশু শ্রমিকরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হত। তাদের উপর শারীরিক নির্যাতনই চালানো হত বেশী। এ মর্মে একটি উদ্ধৃতি নিম্নে উপস্থাপিত হ'ল ঃ

"...children often fell asleep at work and were kept awake by an overseer who grasped the child by his legs and dipped his head first in a barrel of water."[6]

ভোজন অনুষ্ঠান দিনে অনুপস্থিতি হ্রাসকল্পে কোম্পানীর খরচে ভোজনের আয়োজন করা হত। আর্করাইট ও ম্যাথিউ বুল্টন তাঁদের কারখানায় এ ধরনের ভোজন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। "..... Arkwright held a feast for 500 employees at his Cromford mill in 1776 and Matthew Boulton hosted 700 at his Soho plant."[7]

এ ছাড়া শারীরিক নির্যাতন (সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে), আর্থিক জরিমানা এবং কারখানার দরজা বন্ধ করা (কারখানা শুরুর সময়) ইত্যাদি নেতিবাচক শৃঙ্খলা কার্যক্রমও গ্রহণ করা হত। আর্থিক জরিমানার মাত্রা কখনো কখনো অত্যধিক ছিল। দৈনিক মজুরীর চেয়েও এ হার বেশী ছিল। সাপ্তাহিক দুই থেকে তিন ডলার মজুরীর ক্ষেত্রে একদিন অনুপস্থিতিতে ৩০–৭০ সেন্ট আর্থিক জরিমানা করা হত। এ মর্মে একটি নজির নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ "Graduated fines were more common methods of discipline : one plant fined workers 30 cents for being absent Monday morning and 70 cents for singing, swearing or being drunk."[8]

১৭৯৭ সালে Smuel Oldknow (তৎকালে একজন অন্যতম প্রগতিশীল মালিক) কর্তৃক জারীকৃত শৃঙ্খলা বিধির সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত হ'ল। এ বিধি শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার সার্বিক উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্পর্কে আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করতে সক্ষম। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ ঃ

"That when any person, either Man, Woman or Child, is heard to CURSE or SWEAR, the same shall forfeit one shilling—And when any Hand is absent from Work, (unless unavoidably detained by sickness, or Leave being first obtained),

the same shall forfeit as many Hours of Work as have been lost ; and if by the Job or piece, after the Rate of 2 (shillings) 6 (pence) per Day—Such Forfeitures to be put into a Box, and distributed to the Sick and Necessitous, at the discretion of their Employer."[9]

শ্রমিকদের ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। তখন মনে করা হত ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শ্রমিকদের লাগসই মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা গঠনে সহায়ক হবে। ফলে তাদের আচরণ সুশৃঙ্খল ও সংযত হবে। এ মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে তাঁদেরকে কোম্পানী সময়ে ধর্মীয় ও নৈতিক পড়াশুনায় উদ্বুদ্ধ করা হত। এ মর্মে ড্যানিয়েল রেন উল্লেখ করেন, "The encouragement of moral education, even on company time and in early company towns, reading of the "good book", regular church attendance, and exhortations to avoid the deadly sins of laziness, sloth, and avarice were methods of inculcating in the working population the right habits of industry."[10] পোলার্ডের মতে, "The drive to raise the level of respectability and morality among the working classes was not undertaken for their own sake, but primarily…as an aspect of building up a new factory discipline."[11]

কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) শিল্প কারখানার শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে মানব সম্পদের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করতেন যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ অপেক্ষা মানব-সম্পদে বিনিয়োগ অধিকতর লাভজনক। এ মর্মে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, … money spent on improving labor "would return you, not five, ten or fifteen per cent for your capital so expended, but often fifty, and in many cases a hundred percent."[12] এ ধারণার বশবর্তী হয়ে রবার্ট ওয়েন তাঁর নিউ লানার্ক (New Lanark, Scotland) বস্ত্রকলে শ্রমিকদের জন্য একটি মডেল গ্রাম স্থাপন করেছিলেন। উক্ত গ্রামে শ্রমিকদের এবং শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের জন্য কল্যাণকর ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কারখানার পাশে তাঁদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা কার্যক্রমসহ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মানব-সম্পদে তাঁর এ বিনিয়োগের ফলে তিনি নিউ লানার্ক কারখানা থেকে শতকরা ৫০ ভাগ মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি দাবী করেছিলেন যে, এ মুনাফা শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব। এ মর্মে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতাংশ নিম্নে উপস্থাপিত হ'ল ঃ "He (Robert Owen) claimed a 50 percent return at New Lanark, and said it would shortly reach 100 percent."[13]

এ ছাড়া রাবার্ট ওয়েন তাঁর কারখানার শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ মর্মে ড্যানিয়েল রেন উল্লেখ করেন, "At New Lanark, Owen encountered the same disciplinary problems as other manufacturers. Similar to the attempts of others to create a new factory ethos, he tried to use moral suasion rather than corporal punishment."[14]

শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নয়নে আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে এডাম স্মিথের অর্থনৈতিক মানুষ-তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "The liberal reward of labor ... increases the industry of the common people. The wages of labor are the encouragement of...industry ... (and) where wages are high, accordingly we shall always find the workmen more active, diligent, and expeditious than where they are low."[15]

এডাম স্মিথের এ মতবাদ পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল সংগঠন তত্ত্ববিদরা সংগঠনে নিয়োজিত মানব-সম্পদকে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা মনে করতেন আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে শ্রমিকদের আচরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। এ ধারণার ভিত্তিতে তাঁরা সংগঠনে উৎপাদন ভিত্তিক মজুরী ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। ফলে বিভিন্ন ধরনের মজুরী ব্যবস্থার আর্বিভাব ঘটে। এ মজুরী ব্যবস্থার মধ্যে "Differential Piece-rate System, Halsey Premium Plan, Emerson Efficiency System, Straight Piecework, Standard Time Plan, Premium Point System, Group Bonus System."[16] ইত্যাদি অন্যতম।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার শুধুমাত্র শাস্তিমূলক কার্যক্রম বা আইনের প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর ইতিবাচক দিকও রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আচরণ নিয়ন্ত্রণে নেতিবাচক কার্যক্রম (শাস্তিমূলক) অপেক্ষা ইতিবাচক কার্যক্রমে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা বাঞ্ছনীয়। ইতিবাচক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মীর আচরণ পরিবর্তন না হলে বা না হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন নেতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং আইন সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন ছাড়াও কর্মী ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার পরিবর্তিত উদ্দেশ্য

সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব ও কৌশল এবং ব্যবস্থাপকদের

দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ, শিল্প–মালিক সম্পর্ক, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়সমূহ শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। অতীতে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল শাস্তিমূলক। বর্তমানে মূখ্য উদ্দেশ্য শাস্তিমূলক নয় বরং সংশোধনমূলক, শাস্তি প্রদান এখন গৌণ। এ সম্পর্কে একটি চিত্র (চিত্র – ২) নিম্নে দেয়া হল ঃ

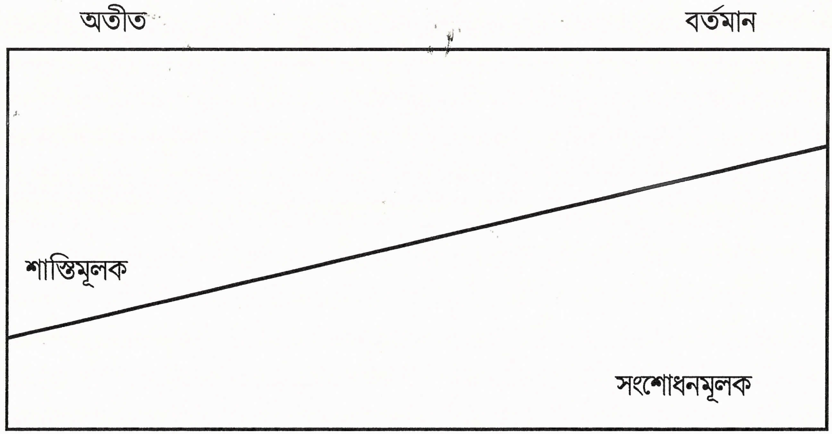

চিত্র – ২। শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য।

উপর্যুক্ত বিবরণীর স্বপক্ষে ষ্টিফেন পি রবিন্সের একটি উদ্ধৃতি নিম্নে উপস্থাপিত হল ঃ "The objective of disciplinary action is not to deal out punishment. The objective is to correct an employee's undesirable behavior."[17]

তাই আইন প্রয়োগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আচরণ সংশোধন/উন্নয়নে অন্য কোন বিকল্প পন্থা রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। আইনের প্রয়োগ সর্বশেষ সম্বল (Last resort) হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ।

আচরণ বিশ্লেষণ

কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা শৃঙ্খলা বিধিসমূহ প্রয়োগের পূর্বে কর্মী ব্যবস্থাপককে প্রথমে উক্ত কর্মচারীর আচরণ বিশ্লেষণ করতে হবে। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মী ব্যবস্থাপক উক্ত কর্মচারীর অনাকাঙ্খিত আচরণের প্রকৃত স্বরূপ

উদঘাটনে সক্ষম হবেন। আচরণ বিশ্লেষণে বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ও কৌশল এ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে একটি সহজ নমুনা প্রক্রিয়া উপস্থাপিত হল (চিত্র–৩) ঃ

অভিযুক্ত কর্মচারী	সমস্যা/অভিযোগের		কার্যক্রম
	লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ	

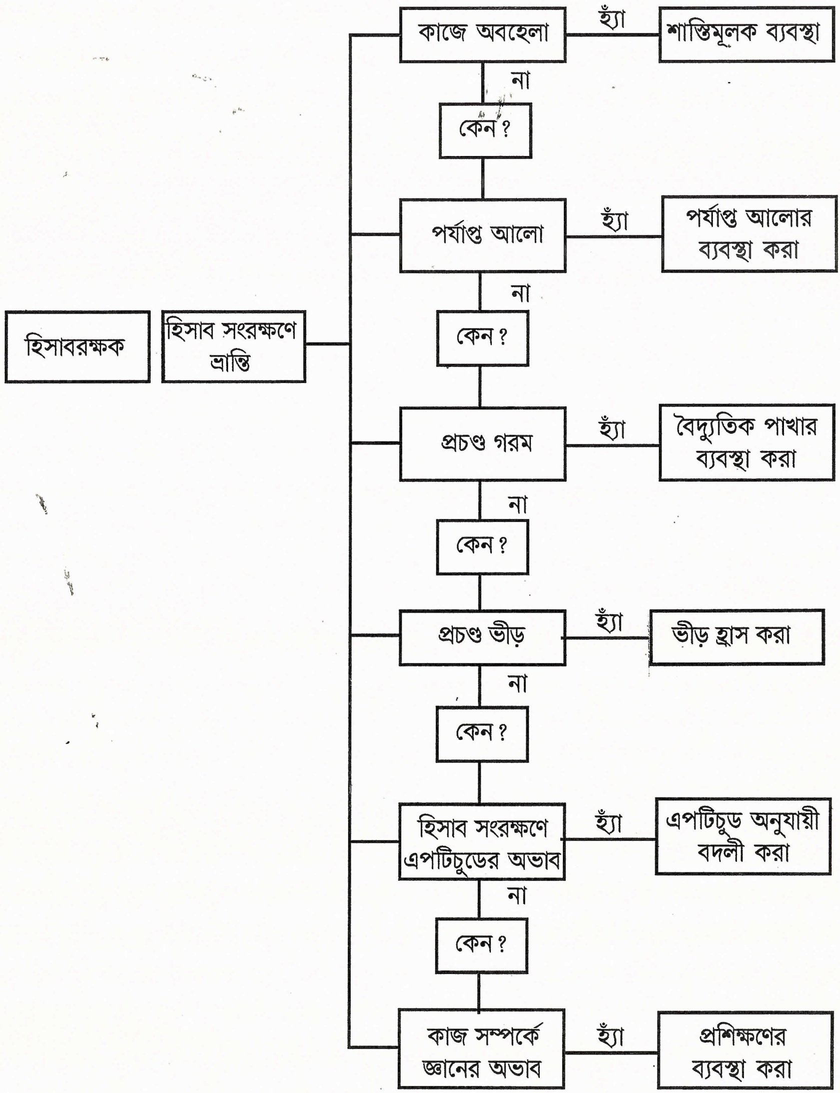

চিত্র – ৩। আচরণ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া।

নমুনা আচরণ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কর্মচারীর অনাকাঙ্খিত আচরণের একাধিক সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে এবং সম্ভাব্য কারণের উপরই লাগসই প্রতিকার নির্ভরশীল। তাই কর্মী ব্যবস্থাপককে অনাকাঙ্খিত আচরণের প্রকৃত কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হতে হবে। এ জন্যে তিনি তার মেধা, প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা, বিচার শক্তি প্রয়োগ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার বা অন্য কোন তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরিতৃপ্ত না হন অথবা তাঁর পক্ষে সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এ প্রক্রিয়া (চিত্র –৩) অব্যাহত রাখবেন। অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা বিধিসমূহ প্রয়োগের পূর্বে তাই প্রত্যেক কর্মী ব্যবস্থাপকের সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার সার্বভৌম ও চিরন্তন নীতিমালা

শৃঙ্খলা ও আপীল সংক্রান্ত বিধিমালা সম্পর্কে কর্মী ব্যবস্থাপকের জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়। তাঁকে অন্যান্য আইন–কানুন ও নীতিমালা ; যেমন—সংবিধান, সহজাত বিচারের নীতিমালা (Principles of Natural Justice) ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে হবে। সংবিধান মূলত একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন। এ আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আইন বা সিদ্ধান্ত অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে। এ মর্মে বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, "...এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে'।[১৮] সুতরাং কর্মী ব্যবস্থাপকের সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা বাঞ্ছনীয়।

সহজাত বিচারের নীতিমালাও সংবিধানের অনুরূপ একটি শক্তিশালী নীতিমালা। এ নীতির লংঘনও আইনের চোখে অগ্রহণযোগ্য। এ নীতির পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্তও আইনের চোখে অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হয়। এ মর্মে Wade উল্লেখ করেছেন যে, "...violation of Natural Justice makes the decision void, as in any other case of ultra vires."[19]

সহজাত বিচারের নীতিমালা অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির অধিকার খর্ব করা, শাস্তি প্রদান বা অন্য কোন ক্ষতিকারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। Sathe এ মর্মে উল্লেখ করেছেন যে, "These rules (Principles of Natural Justice) must be observed by all those authorities whose decisions are likely to affect the rights and liabilities of the persons."[20]

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদের (২) দফায় সহজাত বিচারের নীতিমালাটি স্বীকৃত। উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের

সুযোগ ব্যতিরেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবেনা। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এর কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদের (২) (অ)-(ই) দফায় এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি নিম্নে উপস্থাপিত হল ঃ

"১৩৫ (২) অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে—

(অ) কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, সেই আচরণের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনতি করা হইয়াছে ; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে—যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন—উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে ; অথবা

(ই) রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগ দান সমীচীন নহে" [২১]।

প্রখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টোটল (৩৮৪-৩২০ খ্রীঃ পূঃ) সহজাত বিচারের নীতিকে চিরন্তন নীতি (Universal Law) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যান্য মনীষীরাও এ নীতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বিভিন্ন নামকরণ ; যেমন—Natural Law (Jura Naturalia), Divine Law (Jus Divinium) Enternal Law (Lex Aeterna), The Common or Universal Law (JusCommone, Jus Gentium) করেছেন। এ সকল নামকরণ থেকে সহজেই এ নীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

সহজাত বিচারের নীতি মূলত নিম্নলিখিত তিনটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

১। (ক) কোন ব্যক্তিই নিজের ব্যাপারে বিচারক হতে পারবেন না ;

(খ) কোন বিষয়ে স্বার্থ নিহিত রয়েছে বা কোন পক্ষের বিরুদ্ধে কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব রয়েছে এমন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিচারক হতে পারবেন না ;

২। অন্য পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করতে হবে ;

৩। ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ অবহিত করতে হবে।

অভিযোগ প্রমাণে নিয়োজিত তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় বিচারকতুল্য। বিচারকের ন্যায় তাঁকে সকল অবস্থাতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে

এবং চিরন্তন নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। সংগঠনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যাতে আদালতের দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি এবং বিশেষজ্ঞ আইনজ্ঞের সহায়তার প্রয়োজন না হয় সে জন্যে প্রশাসনকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধিমালা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এর ফলে বিনা ব্যয়ে, আইনজ্ঞের সহায়তা ব্যতিরেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। প্রশাসনকে এ ক্ষমতা অর্পণ করা হলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে এ কাজ প্রশাসনিক নয় বরং বিচারতুল্য (Quasi Judical)। তাই কর্মী ব্যবস্থাপককে এ আইন প্রয়োগের সময় প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে বিচারক-সুলভ ন্যায় ও নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করতে হবে।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মডেল

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামো নিম্নে প্রদর্শিত হল (চিত্র—৪)ঃ

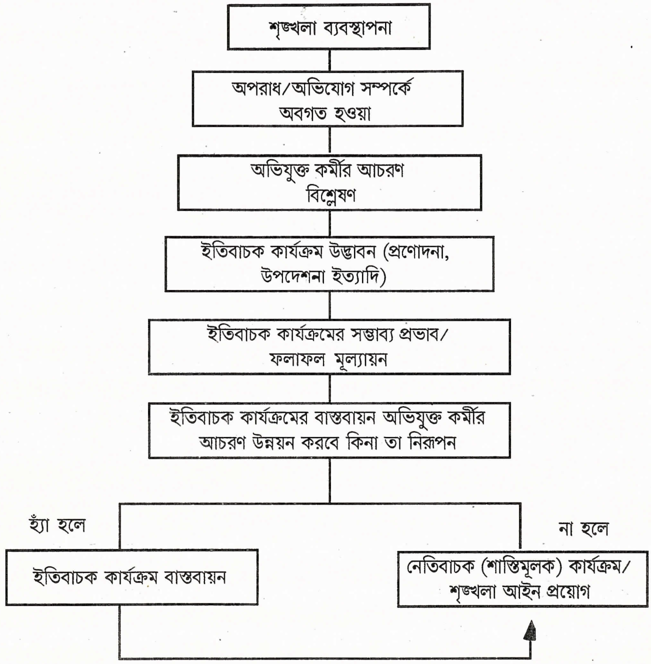

চিত্র – ৪ শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার কাঠামো

উপর্যুক্ত কাঠামোতে ইতিবাচক কার্যক্রমের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইতিবাচক কার্যক্রমে অভিযুক্ত কর্মীর আচরণ সংশোধন/উন্নয়নের সম্ভাবনা না থাকলে অথবা ইতিবাচক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন সম্ভব না হলে আইন অনুযায়ী নেতিবাচক (শাস্তিমূলক) কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ নেতিবাচক কার্যক্রমকে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার বিকল্প মডেল

চিত্র—৪–এ উপস্থাপিত শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মডেল ছাড়াও আরো একটি মডেল চিত্র—৫–এ প্রদর্শিত হ'ল। এ মডেল অনুযায়ী কর্মী ব্যবস্থাপক শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় কার্যক্রমই একযোগে মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের ভিত্তিতে যে কার্যক্রমটি অধিকতর উপযোগী বিবেচিত হবে সে কার্যক্রমটি তিনি গ্রহণ করবেন। এ ব্যবস্থায় কর্মী ব্যবস্থাপক সংগঠন ও অভিযুক্ত কর্মীর উপর শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা লাভে সক্ষম হবেন। ফলে সংগঠনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অনাকাঙ্খিত প্রভাব/ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম মূল্যায়নের একটি নমুনা সারণি—১ এ প্রদর্শিত হ'ল। উক্ত সারণীতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যক্রমের সম্ভাব্য নিয়ামক চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ নিয়ামকসমূহকে রেটিং স্কেলের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিয়ামকসমূহ মূল্যায়নে এ পদ্ধতিই চূড়ান্ত নয়। প্রয়োজনবোধে অন্যান্য পরিমাপক পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি—১–এ প্রদর্শিত নমুনা মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত রেটিং স্কেলের সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপিত হ'ল। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী সর্বাধিক সুফলের জন্য ৪ নম্বর এবং সর্বনিম্ন সুফলের জন্য ১ নম্বর অর্পণ করা হয়েছে ঃ

রেটিং স্কেল		সংজ্ঞা
৪	=	অনেক সুফল
৩	=	যথেষ্ট সুফল
২	=	সামান্য সুফল
১	=	সর্বনিম্ন সুফল

সারণি—১ ঃ শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মূল্যায়ন

অভিযোগ ঃ অফিসে দেরীতে আসা

অভিযুক্ত কর্মী ঃ জনাব/বেগম .... হিসাবরক্ষক।

নিয়ামক	সম্ভাব্য প্রভাব		তারতম্য (+ −)
	ইতিবাচক কার্যক্রম	নেতিবাচক কার্যক্রম	
ক) সংগঠনের উপর প্রভাব			
১। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩	২	১
২। উৎপাদন/সেবা	৩	২	১
৩। পরিবেশ	৪	১	৩
৪। সংস্কৃতি	৪	১	৩
মোট (ক) ঃ	**১৪**	**৬**	**৮**
খ) অভিযুক্ত কর্মীর উপর প্রভাব			
১। নৈতিকতা	৩	১	২
২। বিশ্বাস ও মূল্যবোধ	৩	১	২
৩। হতাশা	৪	১	৩
৪। প্রণোদনা	৪	২	২
৫। তত্ত্বাবধায়কের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	৩	১	২
মোট (খ) ঃ	**১৭**	**৬**	**১১**
সর্বমোট ঃ	৩১	১২	১৯

সারণি – ১ অনুযায়ী শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মূল্যায়নের ফলে বিকল্প মডেলটি নিম্নরূপ হবে (চিত্র – ৫) ঃ

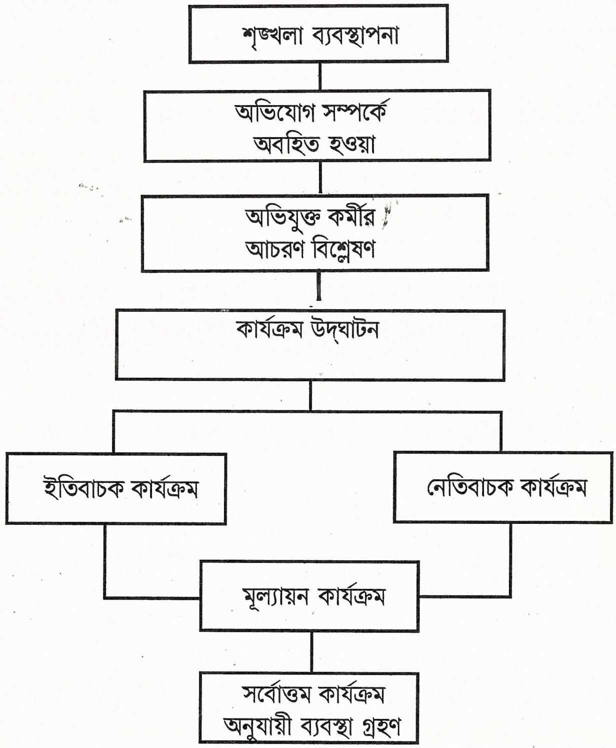

চিত্র – ৫। শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার বিকল্প মডেল।

সুপারিশমালা

১। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ সহ শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল আইনে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়। শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক কার্যক্রমের আলোকে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবলী নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২। অভিযুক্ত কর্মীর আচরণ উন্নয়ন/সংশোধনে শাস্তিমূলক আইন প্রয়োগের চেয়ে ইতিবাচক কার্যক্রমের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা বাঞ্ছনীয়। সংগঠনের শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক কার্যক্রমের সম্ভাব্য প্রভাব/ফলাফল সন্তোষজনক বিবেচিত না হলেই শাস্তিমূলক বা নেতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ নেতিবাচক কার্যক্রম সর্বশেষ পন্থা হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

৩। দীর্ঘ মেয়াদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণ উন্নয়নে ধর্মীয় ও নৈতিকতা কার্যক্রমের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা বাঞ্ছনীয়। এ জন্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক) কর্মজীবন উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় ;

খ) আচরণ ও নৈতিকতার মান উন্নয়নে ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ;

গ) ভবিষ্যত প্রজন্মকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের পাঠক্রমে ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ;

ঘ) শিল্প বিপ্লবের সময় অনুসৃত ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ অফিস সময়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে বই-পুস্তক পাঠে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

৪। কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রয়োজন মাফিক কর্মী পরামর্শক (আচরণ বিজ্ঞানী) নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। অভিযুক্ত কর্মীর আচরণ উন্নয়ন/সংশোধনে উক্ত পরামর্শক অভিযুক্ত কর্মীকে উপদেশনা প্রদান করবেন। পরামর্শকের উপদেশনা ব্যতিরেকে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ কোন অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় এ প্রস্তাবটি সন্নিবেশ করা যেতে পারে।

৫। ভাল আচরণ ও ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ জন্যে প্রয়োজনবোধে আর্থ বিধিমালা সংশোধন করা যেতে পারে।

উপসংহার

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের সকল বিধিমালা সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন সংশ্লিষ্ট আইনের নির্ভুল ও কারিগরি প্রয়োগ নিশ্চিত করলেও সার্বিকভাবে দীর্ঘ মেয়াদে সংগঠনের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিবেশ ও পরিস্থিতি, অভিযুক্ত কর্মীর নৈতিকতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং মন-মানসিকতায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা তা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করে না। তাই প্রত্যেক কর্মী ব্যবস্থাপককে শৃঙ্খলা আইন প্রয়োগের পূর্বে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার মানবীয় দিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে আলোচিত শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য, বিভিন্ন বিকল্প কৌশল, অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আচরণ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এবং সার্বভৌম ও চিরন্তন নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা লাভ কর্মী ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক হবে। ফলে ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আইনের লাগসই প্রয়োগ এবং সার্বিকভাবে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

REFERENCES

1. Daniel A. Wren, *The Evolution of Management Thought* (3rd Edition), (New York : John Wiley and Sons, 1987), p. 13.
2. Fred Luthans, *Introduction to Management : A Contin-gency Approach* (New York : McGraw-Hill Book Company, 1976), p. 5.
3. Daniel A. Wren, *op. cit*, pp. 40-41.
4. J. Powell, A View of Real Grievances (1772) originally quoted in Asa Briggs (ed.), How They Lived, Vol. 3, Oxford : Basil Blackwell, 1969, p. 184. Also quoted by Daniel Wren, "The Evolution of Management Thought", (3rd Edition), (New York : John Wiley and Sons, 1987), p. 41.
5. *Op. cit*, Daniel Wren, p. 41.
6. *Ibid*, p. 50.
7. *Ibid*, p. 41.
8. Sidney, Pollard, The Genesis of Modern Management, "A Study of the Industrial Revolution in Great Britain," Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965, quoted in Daniel Wren, "The Evolution of Management Thought," p. 42.
9. The rule was posted December 1, 1797 and is reprinted in B. W. Clapp (ed), "Document in English Economic History". vol. 1, London : G. Bell and Sons, Ltd, 1976, p. 387, Capital Letters are from the original, quoted in Daniel Wren, "The Evolution of Management Thought", p. 43.
10. *Op. cit*, Daniel Wren, p. 43.
11. Pollard, Genesis, p. 195, quoted in Daniel Wren, "The Evolution of Management Thought", p. 43.
12. Robert Owen, "The Life of Robert Owen", London : Effingham Wilson, 1857 ; reissued by Augustus M, Kelly, 1967 (Vol 1 and 1A), quoted in Daniel Wren, "The Evolution of Management Thought", p. 57.
13. *Op cit*, Daniel Wren, p. 57.
14. *Ibid*, p. 56.
15. Adam Smith, "The Wealth of Nations (1776)", quoted in Briggs, p. 214.
16. A. Matz et. al, "Cost Accounting", (Dallas: South Western Publishing Co, 1967), pp. 322-328.
17. Stephen P. Rabbins, "Personnel : The Management of Human Resources" (Engle Wood Cliffs : Prentice-Hall, Inc., 1982), p. 398.
18. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (ঢাকা: গবর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯১), পৃঃ ৬।
19. Quoted in H. W. R. Wade, "Administrative Law" (Oxford: A Clarendon Press, 1971), p. 172.
20. S. P. Sathe, "Administrative Law" (3rd edition), (Bombay : N. M Tripathi Pvt. Ltd, 1979), p. 164.
21. *Op. cit.*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ১১০।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

থাইল্যাণ্ডের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় কতিপয় দিক

এম, খোরশেদ আলম*

ভূমিকা

বিগত তিন দশকে থাইল্যান্ড যে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা এক বিস্ময়কর সাফল্য হিসেবে অভিহিত হচ্ছে। ১৯৬১ সালে যখন প্রথম জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সচেষ্ট হয়, তখন থেকেই দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে, এবং ঐ সকল দেশের মধ্যে অন্যতম হিসেবে আবির্ভূত হয় যারা উচ্চ, দীর্ঘমেয়াদী ও মুদ্রাস্ফীতিহীন প্রবৃদ্ধি, ফি বছর গড়ে ৭–৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ৫ শতাংশ বা তারও কম হারে প্রতি বছর গড়-নিম্ন-মুদ্রাস্ফীতিতে অবস্থান করেছে (Komin, 1989)। থাই অর্থনীতি তার প্রাধান্যপূর্ণ কৃষি ভিত্তি হ'তে আজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যেখানে শিল্প এবং বহির্বাণিজ্য অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

আজকের থাইল্যাণ্ড সাফল্যলাভে সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পায়িত জাতি হিসেবে অভিহিত হয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমুখী দেশ হিসেবে তার পরবর্তী উন্নয়নের সোপান নির্ধারণ করেছে। যদিও বিশ্ব অর্থনীতির অধিকাংশই আজ মন্দা কবলিত, কিন্তু থাইল্যান্ড অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্মুখ সারিতে। আশির দশকে, বিশ্ব তৈল বাজারে অবিরাম সংকট সত্ত্বেও, থাইল্যাণ্ডের গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মাত্র কয়েকটি দেশ তা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে দেশটি শিল্পোন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় শুরু করার উদ্যোগ ত্বরান্বিত করেছে। চমৎকার বিনিয়োগ পরিবেশ, দারুণ উদার নীতিমালা এবং সেই সংগে শিল্প-পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা ও নিম্ন ঝুঁকিবিহীন প্রত্যার্পণ সুবিধা বিদেশী পুঁজি ক্রমবর্ধমান হারে আকর্ষণ করছে। অর্থনৈতিক উন্নতি আর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্রুত ধাবমান এ গতিতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হইনি।

এক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে—কি সেই অবদানমূলক উপাদান যা দেশটিকে যুক্তিযুক্তভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চস্তর অর্জন এবং কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে ম্যানুফেকচারিং ও সেবাখাতভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরে সক্ষম করেছে?

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতির সমস্যা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে থাই অর্থনীতির কতিপয় অবদানমূলক উপাদান আলোচনা করা হয়েছে, যা আমাদের জন্যও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সরকারী নীতিমালা

অবশ্য থাইল্যান্ডের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুফল বহনকারী উপাদান বহুমুখী ও বহুমাত্রিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানমূলক উপাদান হিসেবে সর্বপ্রথমে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সরকারী বিভিন্ন নীতিমালার কথা উল্লেখ করা দরকার। একথা এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, থাইল্যাণ্ডের অর্থনীতি দীর্ঘ ৩০ বছরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে।

উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ সূচিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে এক নিয়মাবদ্ধ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। ঐ পর্যায়ে, পাশ্চাত্যের উদার দর্শন ও ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত সরকারী কর্মকর্তা, বিশেষ করে যারা ইতঃপূর্বে ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁদের দৃষ্টিভংগিকে বিস্তৃত এবং দেশের জন্য উপযোগী চিন্তাধারা আত্মভূত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছিল, তাঁরা এ উদ্যোগে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। অবাধ অর্থনীতি বা মুক্ত বাজারনীতি অর্থনৈতিক দর্শন হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। এ সূত্রেই, প্রথম ষষ্ঠবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬), দ্বিতীয় (১৯৬৭-৭১) এবং তৃতীয় (১৯৭২-৭৬) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল। শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে আমদানী বিকল্পন নীতি গ্রহণ, পূর্বে আমদানী হত এমন পণ্যাদির দেশে উৎপাদন উৎসাহিতকরণ এবং অর্থনীতির চকমপ্রদ প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করার উপযোগী মৌলিক ও ভৌত অবকাঠামো তৈরী করা হয় (NIO, 1984)।

তিরিশ বৎসরকালব্যাপী গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সরকারী নীতিমালা থাইল্যাণ্ডের এই উজ্জ্বল সামগ্রিক অর্থনীতিক চিত্র উপহার দিয়েছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সূচনাকাল থেকে বিগত ৩০ বছরে দেশটি গড়ে প্রতি বছর ৭.৭ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় বিশ গুণ এবং মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সতেরো গুণ। ১৯৬১ সালের ২,২০০ বাথ থেকে ১৯৮১ সালে ১৭,২৫০ বাথে এবং ১৯৯০ সালে ৩৫,৫০০ বাথে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (Viravan, 1992)।

সারণি-১ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯০-এর হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি হচ্ছে ২১০ ডলার, যেখানে থাইল্যাণ্ডের হচ্ছে ১,৪২০ ডলার। ১৯৬৫-৯০ সালে বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডের মাথাপিছু জিডিপির গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.৭ ও ৪.৪ শতাংশ (WB, 1992)।

সারণি – ১

কতিপয় মৌলিক তথ্য

	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) মধ্য–১৯৯০	আয়তন (হাজার বর্গ কিলোমিটার)	মাথাপিছু জিডিপি	
			ডলার ১৯৯০	গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (শতাংশ) ১৯৬৫–৯০
বাংলাদেশ	১০৬.৭	১৪৪	২১০	০.৭
থাইল্যাণ্ড	৫৫.৮	৫১৩	১,৪২০	৪.৪

সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯২ হতে সংকলিত।

সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে আমাদের যা দৃষ্টিগোচর হয় তা হচ্ছে, থাইল্যাণ্ড পশ্চাৎপদ কৃষিনির্ভরতা থেকে আজ এক নতুন শিল্পায়িত অর্থনীতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে (সারণি–৩ দ্রষ্টব্য)।

উৎপাদন বহুমুখীকরণ

থাইল্যাণ্ডের উৎপাদন বহুমুখীকরণের সরকারী উদ্যোগ এবং সে লক্ষ্যে প্রণীত উদার নীতিমালা হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দেশটিকে সমৃদ্ধির সন্তোষজনক স্তরে উপনীত করেছে। থাইল্যাণ্ড তার কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই বহুমুখীকরণে সমর্থ হয়। বিগত তিন দশকে থাইল্যাণ্ডের কৃষি খাত দর্শনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। বিগত তিন দশকে কৃষি খাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪–৫ শতাংশ। কৃষকদের জন্য প্রদত্ত সরকারী প্রণোদনা কৃষিজ উৎপাদন বর্ধনে অভাবনীয় সাহায্য করে। একক শস্য উৎপাদনকারী দেশ থেকে থাইল্যাণ্ড আজ ৫/৬টি প্রধান শস্যের উৎপাদন ছাড়াও অন্য প্রায় অর্ধ–ডজন সেকেণ্ডারী দ্রব্য এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ফার্ম পণ্যের উৎপাদনকারী। থাইল্যাণ্ড আজ বিশ্বের বৃহত্তম চাল রপ্তানীকারী দেশ।

সারণি – ২

প্রধান শস্যের উৎপাদন, নির্বাচিত বছর, ১৯৬০-৮৬

(হাজার টনে)

শস্য	.৬০	.৭০	.৭৫	.৮১	.৮৫	.৮৬
চাল	৬,৭৭০	১৩,৪১০	১৩,৩৮৬	১৭,৮০০	২০,৫৯৯	১৯,০২৬
রাবার	১৭১.৪	২৮৭.২	৩৪৮.৭	৫০২.০	৭২২.০	৭৯০.০
ভূট্টা	৫৪৩.৯	১,৯৩৮.২	২,৮৬৩.২	৪,০০০.০০	৫,০৩০.০	৪,০৯২.০
ক্যাসাভা	১,২২২	৩,৪৩১	৮,১০০	১৭,৭৪৪	১৯,২৬৩	১৫,২৫৫
ইক্ষু	৫,৩৮২	৬,৫৮৫	১৯,৯১০	৩০,২৬০	২৪,০০০	২৪,৪০০
বাদাম	১৫২	১২৪.৯	৯৯.৯	১৪৬.৫	১৭১.০	১৭১.০
সয়াবিন	২৫.৬	৫০.৪	১১৩.৯	১৩১.৫	৩০৭.৮	৩৫০.০

সূত্র ঃ কোয়াটারলি বুলেটিন, ব্যাংক অব থাইল্যাণ্ড, জুন, ১৯৮৭, পৃঃ ৭৫।

ম্যানুফেকচারিং খাতে বহুমুখীকরণের বিস্তৃতি এবং ফলাফল আরও চমকপ্রদ, বিশেষত এখন সকল ধরনের হালকা শিল্প পণ্যই স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। অধিকন্তু, দেশটি মৌলিক ও ভারী শিল্পও স্থাপন করেছে। উৎপাদন প্রযুক্তি আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের এসেম্বেলিং স্তর থেকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যন্ত্রাংশের সংযোজন স্তরে উপনীত হয়েছে। এখন দেশটি নিজস্ব ব্রাণ্ড নাম প্রবর্তন এবং ডিজাইন উন্নীতকরণ স্তরে আরও অগ্রগতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

সারণি – ৩

উৎপাদন কাঠামো

	জিডিপি (মিঃ ডলার) ১৯৬৫–১৯৯০		মোট দেশজ উৎপাদনের বন্টন (শতাংশ)							
			কৃষি ১৯৬৫–১৯৯০		শিল্প ১৯৬৫–১৯৯০		ম্যানুফেকচারিং ১৯৬৫–১৯৯০		সেবা ইত্যাদি ১৯৬৫–১৯৯০	
বাংলাদেশ	৪,৩৮০	২২,৮৮০	৫৩	৩৮	১১	১৫	৫	৯	৩৬	৪৬
থাইল্যাণ্ড	৪,৩৯০	৮০,১৭০	৩২	১২	২৩	৩৯	১৪	২৬	৪৫	৪৮

সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোট, ১৯৯২ হতে সংকলিত।

সারণি—৩ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালের হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশের মোট জিডিপি হচ্ছে ২২.৮৮ বিলিয়ন ডলার, অন্যদিকে একই সময়ে থাইল্যাণ্ডের জিডিপি হচ্ছে ৮০.১৭ বিলিয়ন ডলার। অথচ ১৯৬৫ সালে এ দুটি দেশেরই জিডিপি মোটামুটি কাছাকাছি ছিল (বাংলাদেশের ৪.৩৮ এবং থাইল্যাণ্ডের ৪.৩৯ বিলিয়ন ডলার)। বিগত

পঁচিশ বৎসরে বাংলাদেশের মোট জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.২২ গুণ, অন্যদিকে থাইল্যান্ডের বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.২৬ গুণ।

সারণি—৩ থেকে এটিও দৃষ্টিগোচর হয় যে, ১৯৬০-এর দশক থেকে থাইল্যাণ্ডের অর্থনীতিতে এক বিস্ময়কর কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশ এবং থাইল্যাণ্ড উভয় দেশেই সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে কৃষি খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের তুলনায় থাইল্যাণ্ডের হ্রাসের হার অনেক বেশী। থাইল্যাণ্ডে জিডিপি-তে কৃষির অবদান অবিচলভাবে (steadily) হ্রাস পেয়েছে—১৯৬৫ সালের ৩২.০ শতাংশ থেকে ১৯৯০ সালে ১২.০ শতাংশে। অবশ্য এ চিত্র এ কথা বলে না যে, এ সময়কালে দেশটি কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রাথমিক কারণ হচ্ছে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ। যদিও কৃষি খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, তথাপি এ কথা বলা যায় যে, আগামী দিনের অনাগত বছরগুলোতেও কৃষি থাই অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। থাইল্যাণ্ডে ১৯৬০-৬৫, ১৯৬৫-৭০ এবং ১৯৭০-৭৭ সময়কালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫.২, ৫.৭ ও ৩.৮ শতাংশ। ১৯৬০-৭৭ সময়কালে থাই কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৪.৯ শতাংশ হারে (WB, 1980)।

সারণি - ৪

অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন (মিলিয়ন ডলার)

	কৃষি		ম্যানুফেকচারিং	
	১৯৭০	১৯৯০	১৯৭০	১৯৯০
বাংলাদেশ	৩,৬৫০	৮,৭২১	৫২৭	১,৭৩০
থাইল্যাণ্ড	১,৮৩৭	৯,৯৪৮	১,১৩০	১৭,৬৩৫

সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯২ হতে সংকলিত।

অপরদিকে যদিও শিল্প ও ম্যানুফেকচারিং উভয় খাতেরই অবদান উভয় দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি বাংলাদেশের তুলনায় থাইল্যাণ্ডে এই বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। থাইল্যাণ্ডে ম্যানুফেকচারিং খাত খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে, জাতীয় আয়ে ১৯৬০ সালে এর অবদান ১১.৯ শতাংশ থেকে ১৯৮০ সালে ২০.৭ শতাংশে এবং ১৯৮৬ সালে ২১.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭৯ সাল থেকেই ম্যানুফেকচারিং খাতের অবদান কৃষি খাতকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৯২ সালে দেশটির জিডিপিতে ম্যানুফেকচারিং খাতের অবদান এসে দাঁড়ায় ২৬.২ শতাংশে, যেখানে কৃষির অবদান ছিল ১৩.১ শতাংশ (Viravan, 1992)।

সারণি – ৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৯০ সালে যেখানে বাংলাদেশে ম্যানুফেকচারিং খাতে মূল্য সংযোজন (Value addition) ৩.২৮ গুণ বেড়েছে, সেখানে থাইল্যাণ্ডে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.৬১ গুণ। অন্যদিকে একই সময়ে বাংলাদেশে কৃষিতে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ঘটেছে ২.৩৯ গুণ, থাইল্যাণ্ডে এ বৃদ্ধির হার ৫.৪২ গুণ। ১৯৬০–৬৫, ১৯৬৫–৭০ এবং ১৯৭০–৭৭ সময়কালে থাইল্যাণ্ডে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৩, ১০.৪ ও ৮.৫ শতাংশ, অন্যদিকে ম্যানুফেকচারিং খাতে একই সময়কালে এ হার ছিল যথাখমে ১০.৭, ১০.৩ ও ৯.৬ শতাংশ (WB, 1980)। এ উপাত্ত এই নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশের তুলনায় থাইল্যাণ্ডের অর্থনীতি অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ।

বেসরকারী খাতে প্রণোদনা

অপর ইতিবাচক অভিজ্ঞতা যা আমরা কাজে লাগাতে পারি তা হচ্ছে একটি শক্তিশালী বেসরকারী খাত গঠনে থাইল্যাণ্ডের সাফল্য। এটি বস্তুতপক্ষে ষাটের দশকের ঊষালগ্ন থেকে বেসরকারী বিনিয়োগে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উদার উদ্দীপনার ফসল। সরকার বাধ্য হয়েছিল অর্থনীতিতে তার হস্তক্ষেপ হ্রাস করতে। এ প্রক্রিয়ায়, এটি বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসতে প্রণোদিত করে। সরকারী ও বেসরকারী খাতের সহযোগিতাও সহগামীভাবে (Concomitantly) বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারী খাতের বিস্তৃত উন্নয়নে সুদৃঢ় সরকারী সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ফলে বেসরকারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং দিনকে দিন তা শক্তিশালী হতে থাকে। এক্ষেত্রে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট অথোরিটি অব থাইল্যাণ্ড (আইইএটি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭২ সালে আইইএটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আইইএটি–এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে শৃংখলাবদ্ধ ও পর্যায়ক্রমিক শিল্প উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী 'শিল্প এলাকা' (Industrial estate) স্থাপন করা। এ শিল্প অনেকাংশে 'শিল্প শহর' (Industrial city)–এর মতই। শিল্প এলাকা মৌলিকভাবে দু'টি জোনে বিভক্ত—সাধারণ শিল্প এলাকা এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা। একটি সাধারণ শিল্প এলাকা হচ্ছে ঐ সকল শিল্প স্থাপনের জন্য যা রপ্তানী অথবা দেশীয় ভোগের জন্য দ্রব্যাদি তৈরী করে থাকে। অপরদিকে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা হচ্ছে ঐ সকল শিল্প স্থাপনের জন্য যা কেবলমাত্র রপ্তানীর জন্য পণ্য তৈরী করে থাকে। একজন উৎপাদনকারীর পক্ষে শিল্প এলাকায় তার শিল্প কারখানা স্থাপনে প্রধান সুবিধা হচ্ছে খুবই যুক্তিসংগত অথবা কখনো কখনো হ্রাসকৃত মূল্যে মৌলিক অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ জমির মালিকানা অর্জন। অধিকন্তু উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ধরনের সুবিধাদি গ্রহণের অধিকার পায়।

এ এলাকায় সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক, হাসপাতাল, শপিং কমপ্লেক্স, টেলেক্স/পোষ্টঅফিস, স্কুল এবং শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন একই

কম্পাউণ্ডের মধ্যে অবস্থিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ (Self-contained community)। ঐ সমাজে আইইএটি থাই এবং অ-থাই উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প স্থাপনের আবেদন করা থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সেবা ও সুবিধা One-stop-service-এর আওতায় প্রদান করে থাকে। ১৯৭২ সালে আইইএটি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শিল্প এলাকার স্থাপনা ব্যাংকক মেট্রোপলিটান এলাকা অতিক্রম করে আজ দেশের অন্যান্য প্রদেশেও সম্প্রসারিত হয়েছে।

বর্তমানে থাইল্যাণ্ডে মোট শিল্প এলাকার সংখ্যা হচ্ছে ৪২টি। তন্মধ্যে ৪টিতে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন চলছে, ৮টি নির্মাণাধীন, ৩টির প্রস্তুতির কাজ চলছে, ২৩টির সমীক্ষা চলছে এবং ৪টি বিশেষ এসাইনমেন্টের অধীনে রয়েছে (IEAT, 1992)। যেখানে থাইল্যাণ্ডে বেসরকারী খাত অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধির সক্রিয় এজেন্টে পরিণত হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্থ ও আত্মবিশ্বাসহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে বেসরকারী খাত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় ভাবমূর্তি গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। থাইল্যাণ্ডে বেসরকারী খাতে যদিও সরকারী হস্তক্ষেপ ছিল এবং আছে, তদপুরি তা বাংলাদেশের মত প্রতিবন্ধকমূলক নয়, চরিত্রে এবং কার্যক্ষেত্রে সহায়তামূলক (supportive)। এ ক্ষেত্রে জাপানের উদাহরণও প্রাসংগিকভাবে আসতে পারে। জাপানের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংগে জাপানী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সৌহার্দ ও সহযোগিতা কিংবদন্তীর মত। আমাদের দেশে বেসরকারী খাতের প্রতি সরকার সাধারণত নিয়ন্ত্রণমূলক (regulatory) এবং কখনো কখনো প্রতিবন্ধকমূলক (restrictive) ভূমিকা পালন করেছে। নিয়ম আর নীতির এক অদ্ভুত বেড়াজাল আর কঠোর নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী খাতকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অপরদিকে সরকার ও সাহায্যদাতাদের পক্ষ থেকে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে আমাদের বেসরকারী খাত, যা যে-কোন বিশুদ্ধ মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রাণ, তার সততা আর দক্ষতা প্রমাণে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তি উদ্যোগ এবং উদ্যোক্তা শ্রেণীর অভাব বর্তমানে এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে যেখানে চিনি, বস্ত্র, ম্যাচ বক্স, ডিমসহ প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যই এখন প্রতিবেশী দেশ থেকে হয় আমদানী হচ্ছে অথবা চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করছে। আমাদের দেশের তথাকথিত উদ্যোক্তা অথবা শিল্পপতি শ্রেণীর মধ্যে যে প্রবণতাটি প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে তারা দেশে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিবর্তে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায় বেশী আগ্রহী।

সম্প্রতি সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে এবং একই সংগে বিদেশী পুঁজিকে আকৃষ্ট করতে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করছে। বস্তুতপক্ষে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে আকৃষ্ট এবং উদ্যোক্তাদেরকে পুনর্জীবিতকরণ এবং সহায়ক বিনিয়োগ পরিবেশ সৃজনে সরকারী নীতিমালার ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। ক্রমবর্ধমান চোরাচালান, সংকুচিত বাজার, বৃহত্তর জনগোষ্ঠির নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা, শিল্প এলাকায় শ্রমিক অসন্তোষ, দুর্বল অবকাঠামো, আমদানীকৃত কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, সরকার কর্তৃক ঘোষিত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে জটিলতা, লোড শেডিং ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নিম্নশ্রম

উৎপাদনশীলতা, এবং সর্বোপরি প্রশাসনের সর্বস্তরে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি উদ্যোক্তা শ্রেণীকে অহরহ বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করছে। সাম্প্রতিককালে সরকারের অবাধ আমদানী নীতির কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে দেশীয় বিনিয়োগকারীরা নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ পাচ্ছে না । বিশ্ব বাজার এমনকি প্রতিবেশী দেশগুলোর সংগে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি না করে উদার আমদানী নীতি অথবা অবাধ বাজার নীতি প্রবর্তন করে প্রকারান্তরে দেশীয় শিল্প কারখানাগুলোকে সংকটের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। এ প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর না হলে উদ্যোক্তা শ্রেণী এগিয়ে আসবে এমনটা আশা করাও বাতুলতামাত্র। অধিকন্তু, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও কখনো কখনো সমস্যাকে প্রকট করে তোলে। এসব কারণে সরকারের বিঘোষিত বাজার সহায়ক (Market friendly) নীতি সফলতার মুখ দেখছে না।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

অন্য এক সাফল্য যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে তা হচ্ছে দেশটির বিগত তিরিশ বছরব্যাপী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করার অনুসংগ হিসেবে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন। মৌলিক এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধাদি ছাড়া বেসরকারী উদ্যোগ নির্ভর এ সকল উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশটির সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি ; যথা—সেচ, পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যাংকিং, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থার উন্নতি সাধনে ব্যাপক বিনিয়োগ করে। থাইল্যাণ্ড পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। দেশটি একই সংগে স্থল, জল ও সমুদ্র পথে এক কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট ও সমুদ্র বন্দরের সুবিধা এবং দেশব্যাপী রাস্তা ও হাইওয়ের ব্যাপক নেটওয়ার্ক দেশটির জাতীয় অর্থনীতির সকল খাতে চমকপ্রদ উন্নতির স্বাক্ষর প্রদান করে। অপরদিকে, আমাদের দেশে অবকাঠামো খুব দুর্বল। যদিও সম্প্রতি সরকার ভৌত এবং সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ খাতে এক উচ্চাভিলাষী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, সেবাদির মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদিতে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণে বেসরকারী খাতকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত থাইল্যাণ্ড ফিল্ড মার্শাল সারিৎ থানারাত (১৯৫৮–১৯৬৩) এবং ফিল্ড মার্শাল থানম কিটিকাচরণ (১৯৬৩–১৯৭৩)–এর নেতৃত্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভোগ করে। এ সময়কালেই থাই অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয়েছে অপ্রত্যাশিত গতিতে। ১৯৩২ সালে সংঘটিত এক ক্যুদেতার মাধ্যমে দেশটি চরম রাজতন্ত্র (absolute monarchy) থেকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকেই

দেশটি, মাত্র কয়েক বছরের আধা–গণতান্ত্রিক সরকার শাসিত শাসন ছাড়া একনায়কতান্ত্রিক সামরিক শাসক দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে (NIO, 1984)। কেবলমাত্র ১৯৬২ সালে এক রক্তক্ষয়ী গণজাগরণের পর প্রথমবারের মত এক অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়। যদিও ক্ষমতাসীন শাসক সম্প্রদায় প্রায়শই ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তাতে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা কখনো প্রভাবান্বিত হয়নি। সময়ের দীর্ঘ পরিসরে মৌলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে (rational) অপরিবর্তিত থেকে গেছে, যা যে–কোনভাবেই হোক না কেন সরকারের পরিকল্পনা ও নীতিমালার মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং দেশী ও বিদেশী পুঁজির নিরাপত্তা প্রদান করেছে। যদিও রাজনৈতিক গোলযোগ ও থাই রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ঘটেছে ঘন ঘন, তথাপি শ্রমিক শ্রেণী খুবই শৃংখলাবদ্ধ এবং অসন্তোষ আর সন্ত্রাস থেকে প্রায় মুক্ত। অন্যদিকে আমাদের দেশের চিত্র প্রায় উল্টো। এখানে শিল্পখাতের শ্রমিক শ্রেণী এক নৈরাজ্যকর অবস্থায় আছে। ঘন ঘন ষ্ট্রাইক এবং কর্ম–বিরতি ইতিমধ্যে আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করেছে।

রপ্তানী–মুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল

সত্তরের দশকের শুরু থেকেই থাইল্যাণ্ড এক বহির্মুখী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। যদিও ১৯৬০–এর দশকে আমদানী পরিকল্পনার লক্ষ্যে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ১৯৭০–এর দশকে এসে রপ্তানীমুখী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে তা সফলতা অর্জন করে। এ পর্যায়ে বৈদেশিক বাজারের সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য আমদানী–বিকল্প–এর পরিবর্তে রপ্তানী–মুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল গৃহীত হয়। সরকারও রপ্তানী–মুখী শিল্পে উৎসাহ প্রদান করে। এ কাজে দেশটি সফল হয়—রপ্তানীই হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। জিডিপির অংশ হিসেবে, রপ্তানী ১৯৭১ সালের ১০.৯ শতাংশ থেকে ১৯৯১ সালে ৩০.৭ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। বিগত তিন দশকে মোট রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বার্ষিক ১৫ শতাংশ হারে। এ সময়কালে রপ্তানীর অবকাঠামোতেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গতানুগতিকভাবে, থাইল্যাণ্ড হচ্ছে কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক দেশ যেখানে কৃষি খাত দেশটির রপ্তানী আয়ের এক বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। যদিও সময়ের পরিসরে রপ্তানীতে মোট কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, কৃষিজ রপ্তানী ১৯৬০ সালে ৮৪.৩৮ শতাংশ থেকে ১৯৮৬ সালে ৩৪.৩০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে, মানুফেকচারিং দ্রব্যাদির রপ্তানী ১৯৬০ সালে মোট রপ্তানী আয়ের ২.৪ শতাংশ থেকে ১৯৮৬ সালে ৫৪.৯ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে (Komin, 1989)। সামগ্রিকভাবে, রপ্তানী খাতের সাফল্য সম্ভব হয়েছিল থাই রপ্তানী দ্রব্যাদির বিশ্ববাজারে মূল্য বৃদ্ধি, রপ্তানী বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে। এ ক্ষেত্রে থাইল্যাণ্ড

অত্যন্ত সফলতার সংগে জাপান এবং এশিয়ার নতুন শিল্পায়িত দেশসমূহকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। থাইল্যাণ্ডের রপ্তানীর দ্রুত বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে দ্রুততর করেছে, যা অনুসরণ আমাদের জন্যও উপকারী হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য থাইল্যাণ্ড এক উন্নয়ন মডেল

নিঃসন্দেহে থাইল্যাণ্ডের অতীত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। যদিও থাইল্যাণ্ড উন্নয়নের জন্য কোন পূর্ণাংগ মডেল নয়, তথাপি উক্ত অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ আমাদের জন্য উপকারী হ'বে এ অর্থে যে তা আমাদের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করবে। এ প্রসংগে বলতে হয়, সর্বপ্রথমে, আমাদেরকে অর্থনীতিকে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে জাগ্রত করতে হবে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। সরকারের উচিত দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত নীতি কৌশল গ্রহণ করা।

সর্বোপরি, আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এক অংগীকারাবদ্ধ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা দেশটি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর এবং সেই সংগে নীতিমালার ব্যাপারে সার্বিক (holistic) দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করবে।

থাইল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে একদিকে আমরা যেমন কিছু ইতিবাচক উপাদান পাই যা অনুসরণ আমাদের জন্য সুফলবাহী হতে পারে, তেমনি কিছু নেতিবাচক উপাদানও রয়েছে যা আমাদেরকে সতর্কতার সংগে পরিহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, থাইল্যাণ্ড এতকাল তার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত প্রভাব (environmental impact)-এর বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেনি। পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনায় না এনে অপরিকল্পিতভাবে পর্যটন সুবিধা, শিল্প-কারখানা, নগরায়ন, গলফ ক্লাব ইত্যাদি সম্প্রাসরণের ফলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অপরিকল্পিত ও এলোমেলো (indiscriminate) যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাবে ব্যাংকক আজ এক 'যানযটের নগরী'। সেক্স-ব্যবসা নির্ভর পর্যটন শিল্প সম্প্রসারণের কারণে এইডস ভয়াবহ আতংকের সৃষ্টি করেছে। ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম বৈষম্য সামাজিক সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে। দীর্ঘকাল সামরিক শাসনাধীনে থাকার কারণে শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি।

এখানে থাইল্যাণ্ডের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অবদানমূলক উপাদানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিবেচনা ও কার্যকর করা যেতে পারে। যদিও উন্নয়নের কোন recipe নেই, কিন্তু থাইল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা যদি কার্যকরভাবে জানতে পারি যে, আমাদেরকে কি করতে হবে এবং কি করা যাবে না, তাহলে আমরা থাইল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরে খুব অল্প সময়ে পৌছতে পারবো।

গ্রন্থপঞ্জী

1. IEAT, 1992 , Industrial Estate Authority of Thailand, 1992, *Industrial Estate in Thailand,* Bangkok.
2. Komin, 1989, Suntaree Komin, 1989, *Social Dimensions of Industrialization in Thailand,* National Institute of Development Administration, Bangkok.
3. NIO, 1984, National Identity Office, 1984, *Thailand in the 80s,* Bangkok.
4. Viravan, 1992, Amnuay Viravan, *'Thailand : a most Appropriate Model'* in Bangkok Post, August 18, 1992.
5. WB, 1980, The World Bank, 1980, *Thailand Towards a Development Strategy of Full Participation,* Washingtion D. C.
6. WB, 1992, The World Bank, 1992, *World Development Report,* Washington D. C.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও বনসম্পদ : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

কাজী হাসান ইমাম*

ভূমিকা

পরিবেশ উন্নয়নে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নই একমাত্র উপায় নয়। মানুষের নানাবিধ কার্যক্রম ছাড়াও প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সে কারণে শুধুমাত্র বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পরিবেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের বিবিধ প্রতিক্রিয়া বিশ্ববাসীকে শংকিত করে তুলেছে। পরিকল্পিতভাবে হোক আর অপরিকল্পিতভাবে হোক মানুষ তার প্রয়োজনে বনোজাড় করছে ; আবার পরিবেশের বিভিন্ন উপদানের ভারসাম্যহীন পরিবর্তন একদিকে যেমন বনোজাড় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে, অন্যদিকে বনোজাড়ের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ পরিবেশ বিপর্যয়।

বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের প্রকৃতি ও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। গহীন অরণ্যাঞ্চল বলে আফ্রিকা মহাদেশের যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল, আজ তা' বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; অনেক দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে সবুজ বন ; দেখা দিচ্ছে প্রচণ্ড জ্বালানী সংকট ; বিস্তৃতি ঘটছে সাহারার ; খরার কবলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে মানুষ ; কোথাও কোথাও দেখা দিচ্ছে ঘন ঘন বন্যা, ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস ; বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ। ১৯৭০ সালে ঘানার বনভূমির পরিমাণ ছিল ৮৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। আজ সেখানে বনভূমির পরিমাণ কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৭০০ বর্গকিলোমিটারে। একইভাবে গত পাঁচশত বছরে চিলির ৭০ লক্ষ হেক্টর বনভূমির শতকরা ৫৮ ভাগ নিঃশেষ হয়ে গেছে। চীনে প্রতি বছর ৬.৭ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বনোজাড়ের বর্তমান প্রকৃতি অব্যাহত থাকলে আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ ফিলিপাইন্‌স-এ আর কোন বনভূমি থাকবেনা বলে সেখানকার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। বিশ্বব্যাপী ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বন গড়ে উঠতে সময় লেগেছে ১০ কোটি বছর। কিন্তু বর্তমানে যে হারে এই বনের বিনাশ চলছে তাতে আগামী এক শতাব্দির মধ্যে তা' উজাড় হয়ে যাবে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আশংকা প্রকাশ করছেন। ষাটের দশকের ইন্দোনেশিয়ার ১৪৩ মিলিয়ন হেক্টর বনরাজির এখন মাত্র ৩২ মিলিয়ন হেক্টর অবশিষ্ট আছে। বাংলাদেশের বনোজাড়ের গতি প্রকৃতিতেও মোটামুটি একই ধারা বহমান।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা -১৩৪৩।

পৃথিবীর সবচেয়ে জন-অধ্যুষিত দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় এর বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। যা আছে, অঞ্চলভেদে তার বণ্টনও খুবই অসম। দেশের বার্ষিক বনোজাড়ের পরিমাণ প্রায় ০.৫৫ শতাংশ বা ১৭৯,২৮৮ একর *(Ali, 1990, পৃ.১)*। দারিদ্র, জনসংখ্যার দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং ভূমির ওপর অত্যাধিক চাপ এই বনোজাড় প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করছে। এ সমস্ত কারণে মারাত্মক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে আবর্তক প্রাকৃতিক দুর্যোগে অপরিমেয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এদেশের অর্থনীতি ও জনপদ। আর তাই, পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

সুদূর অতীতকাল থেকেই বংগদেশ নামক এই ভূ-খণ্ডটি ছিল ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ। ক্রান্তীয় জলবায়ু ও উর্বর মাটির কারণেই এখানে সৃষ্টি হয়েছিল একটি চিরহরিৎ অরণ্যের ঘন আচ্ছাদন *(Rashid, 1977, পৃ. ১২৯)*। মূলত: বৃটিশ ঔপনিবেশিককাল থেকেই এদেশে শুরু হয় ব্যাপক অরণ্য নিধনযজ্ঞ। এ সময়ে খুব সীমিত পরিসরে বৃক্ষায়নের মাধ্যমে নতুন বন সৃষ্টির প্রক্রিয়া চালু থাকার চিত্র পাওয়া গেলেও ধীরে ধীরে বন কেটে কৃষির পত্তন ঘটানো হয় ; গড়ে ওঠে জীবন সংগ্রামী বসতি এবং নির্বিচারে উজাড় হ'তে থাকে এদেশের বনসম্পদ। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং পরবর্তীতে বনের এই নিধনযজ্ঞ, বিশেষত: গ্রামীণ বনোজাড় বেড়ে চলে আরো দ্রুতগতিতে। দ্রুত গ্রামীণ বনোজাড়ের সংগত কারণ হিসেবে এখানে ১৯৭১ সালের বন্যা, যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি ও ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকে দায়ী করা হয়। এ সময়ে মানুষ নির্বিচারে বাড়ীর আশে-পাশের গাছ-পালা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে বেছে নেয়। দারিদ্রের চরম নিপীড়নে গ্রাম-বাংলায় এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত।

কিন্তু "....একটি এলাকার সুস্থিত উদ্ভিজ্জ বা 'কলাইম্যাক্স ভেজিটেশন' বিনষ্ট হওয়ার অর্থ কতগুলো গাছপালা নির্মূল হওয়া নয়—সেই সংগে প্রাণিকুল, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিও নির্মূল হয়ে যাওয়া, 'ট্রাফিক লেভেল' বা অস্তিত্ব স্তরসমূহের অবলুপ্তি হওয়া, 'ইকোসিসটেম' বা বাস্তব্যরীতিতে বিপর্যয় আসা...." *(চৌধুরী, ১৯৮৮, পৃ. ২২)*। সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে এখনই এ চেতনাবোধের উৎসারণ ঘটানো না গেলে বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডটি ক্রমাগত আরো বনহীন হয়ে পড়বে এবং অদূর ভবিষ্যতে অপ্রতিরোধ্য আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাংলাদেশের বনসম্পদ সুদীর্ঘ কালের এক অবহেলিত অধ্যায়। কালের অবধারিত প্রবাহে ভবিষ্যতের বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য মানুষ খুঁজে ফিরছে অর্থনীতি ও পরিবেশ-প্রতিবেশের মধ্যে একটি সুসামঞ্জস্য সম্পর্ক ও সুষ্ঠু সমন্বয় *(Zellentin, 1987, পৃ. ১১)*। বাংলাদেশও এখন আর এই চেতনাবোধের বাইরে নয়। তাই সূচনালগ্নে এ প্রবন্ধের বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও উপকারে আসবে বলে আশা করা যায়।

বনসম্পদের পরিবেশ-গুরুত্ব

বনভূমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, বন্যা, খরা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ও বায়ুশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে *(FFYP, 1990, পৃ. V.E. 1)*। দু'টি বসতির মাঝখানে যদি বিস্তৃত একটি সবুজচত্বর (বনভূমি) থাকে তা'হলে শুধুমাত্র ঐ বনভূমি এলাকার বায়ুই যে তা'দ্বারা প্রভাবিত হবে তা' নয়, বরং তা' উক্ত বসতি দু'টির জন্য বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রকের কাজ করবে ; বনাঞ্চল ছাড়াও তার চারপাশের বহুদূর পর্যন্ত বায়ুর আর্দ্রতা ঘনীভূত করবে ; এই ঘনীভবনের মাধ্যমে বায়ুতে অবস্থিত দূষিত পদার্থের পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে এবং বৃষ্টিপাত, কুঁয়াশা ও তুষারপাত ইত্যাদির মাধ্যমে বায়ু শোধিত হবে *(Geiger, 1961, পৃ. ৬১)*। বসতির ঘনত্ব ও উলম্বিক উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন স্থানের বায়ুঘনত্ব ও বায়ুর গতিমাত্রা কমতে থাকে ; ফলত: স্থানটিতে আবহাওয়া ও জলবায়ুগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় *(Miess, 1978, পৃ. ৮৭)*। পরিমিত বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে এসমস্ত এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা নিরসন করা যায়।

"শব্দদূষণ" আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানের একটি বিশেষ বিবেচনাযোগ্য দিক। শব্দদূষণ প্রক্রিয়াকে স্তিমিত করতে বনবৃক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণত উন্নত বিশ্বের মহাসড়কগুলোর পাশে অবস্থিত বসতিসমূহকে শব্দদূষণের হাত থেকে রক্ষার্থে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে উক্ত স্থানে মহাসড়কের দু'পাশে বিশেষ প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এ জাতীয় বৃক্ষায়ণের ফলে মহাসড়কে উৎপন্ন বিকট শব্দ বসতিতে পৌঁছে না, যদিও বসতিগুলো মহাসড়কের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। শব্দদূষণ থেকে বসতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে চিরহরিৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনায়ন অত্যন্ত কার্যকরী। চিরহরিৎ পত্রযুক্ত ঝাক্ড়ানো বৃক্ষের মাঝে মাঝে সূঁচাকার পত্রযুক্ত বৃক্ষ (যেমন, ঝাউগাছ) রোপণের মাধ্যমে এই "শব্দদূষণ প্রতিরোধক বুহ্য"কে অধিকতর কার্যকরী করা যায় *(Haupt, 1973-74, পৃ. ৩১)*।

বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত "গ্রীণ-হাউস প্রভাব" প্রশমিতকরণে বনের ভূমিকা অপরিসীম। গ্রীণ-হাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্যাসের ৪৯ শতাংশ হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড *(মণ্ডল, ১৯৯৪, পৃ. ২)*। শুধুমাত্র বিশ্বের বনাঞ্চল সংরক্ষণ বা অধিকতর বনায়নের মাধ্যমে পৃথিবীকে এ প্রভাব থেকে মুক্ত করা যাবেনা সত্যি, কিন্তু বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিনিয়ত যে হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশছে, উদ্ভিদের প্রস্বেদন ও সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিশোধনে সক্ষম। পৃথিবীকে গ্রীণ হাউস প্রভাব থেকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম তিনটি পদক্ষেপ হচ্ছে বনাঞ্চল সংরক্ষণ, অধিকতর বনায়ন ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন *(সিদ্দিকী, ১৯৯৪, পৃ. ৯)*। আর এ তিনটি পদক্ষেপের সাথে বনসম্পদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবং পানিসম্পদ উন্নয়নে বনের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বনহীন এলাকার ভূমি নিম্ন-জলপ্রবাহের তীব্রতা বন এলাকার ভূমি নিম্ন-জলপ্রবাহ থেকে অনেক বেশী। বৃক্ষরাজি মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ধ'রে রাখতে সহায়তা করে এবং ভূমি নিম্ন-জলস্রোতের তীব্রতাকে হ্রাস করে। এভাবে বৃক্ষরাজি কৃষি উৎপাদনে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বনের এই প্রভাবসমূহ বন এলাকার বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে *(Barner, 1983, পৃ. ৩১-৩৪)*। পানিশোধন ও পানির জীবরাসয়নিক প্রক্রিয়ায় যেমন, অক্সিডাইজেশন, ভূমিস্থিত সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রতিক্রিয়া নিরাময়করণ ইত্যাদিতে বনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে *(Barner, 1983, পৃ. ১৫৯-১৬০)*। চিরহরিৎ বনরাজি মাটির ক্ষয়প্রাপ্তি ও ভূমিধ্বস রোধ করে। আইভরি কোষ্টের বনভূমিসমৃদ্ধ উপত্যকায় প্রতি বছরে যেখানে হেক্টর প্রতি মাত্র ৩০ কেজি মাটি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যায়, সেখানে বৃক্ষহীন উপত্যকা থেকে মাটি নিষ্কাশনের পরিমাণ বছরে হেক্টর প্রতি ১৩৮ টন *(সিদ্দিকী, ১৯৯৪, পৃ. ৭)*। এ তথ্য থেকেই মাটির ক্ষয়রোধে চিরহরিৎ বনরাজির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জ্বালানী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আসলেও তৃতীয় বিশ্বের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে বনসম্পদের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। একথা উল্লেখ্য যে, আজ থেকে মাত্র এক শতাব্দি আগেও সারা বিশ্বে বনজ-জ্বালানীই ছিল জ্বালানী শক্তির প্রধানতম উৎস। ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে, আবিষ্কৃত হয়েছে নানা খনিজ পদার্থ এবং জ্বালানী শক্তির উৎসের স্বরূপ ব্যাপকভাবে পাল্টে গেছে পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর হাতে এমন কোন আলাদীনের প্রদীপ নেই যা' দিয়ে রাতারাতিই তারা তাদের জ্বালানী শক্তির উৎসের স্বরূপকে ভেল্‌কিবাজির মত পাল্টে দিতে পারে। আর তাই, জ্বালানীর ক্ষেত্রেও "বনজ-জ্বালানী" আজও এসকল অঞ্চলে প্রধানতম উৎস হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া বনসম্পদ কাঠভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় ; শ্রমশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে বনভিত্তিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বনসম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ক্ষেত্রে বনসম্পদ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বনভূমি থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন দ্রব্যাদি দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সামগ্রিকভাবে অন্য সম্পদের ওপর চাপ কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।

বাংলাদেশের বনপরিস্থিতি এবং তার আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রভাব

একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ঐ দেশের মোট আয়তনের ন্যূনপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক *(চৌধুরী, ১৯৮৮, পৃ. ৬১)*। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জিতে ১৯৮৫-৮৬ সালে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ১৩.৪১ শতাংশ দেখানো হয়েছে। একই সময়ে পরিচালিত অর্থনৈতিক জরীপে বনাঞ্চলের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৯.৩ শতাংশ ; দি টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ১৯৯১-তে বনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ৯.৮৭ শতাংশ (সারণী-১)। অনেকের মতে এর প্রকৃত পরিমাণ আরো কম। অবশ্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রিপোর্ট ও বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত উপাত্ত অনুসারে বর্তমানে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৭ শতাংশ। অন্যদিকে একই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বার্মা, নেপাল প্রভৃতি দেশের বনভূমির পরিমাণ অনেক বেশী। ইন্দোনেশিয়ার বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ, যা ইউরোপের তুলনায় ২.৫ গুণ বেশী *(The World Bank, 1990, পৃ. xix-xx)*।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বনভূমি সংক্রান্ত উপাত্তের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞসহ সকল মহল এব্যাপারে একমত যে, বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ন্যূনতম সীমারেখারও অনেক নীচে। সমস্যার গভীরতা আরো বেশী অন্যখানে। দেশের বনসম্পদের পরিমাণ যা-ই থাকুক না কেন তা' সুষম বন্টিত নয় (সারণী-১ ও ২)। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমির ৯০ শতাংশেরও বেশী দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মাত্র ১২টি জেলায় পুঞ্জীভূত ; ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টিতে কোন রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই *(FFYP, 1990; পৃ. V.E.1)*। মোট বনভূমির মাত্র ৯ শতাংশ রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত। অথচ এ দু'টি বিভাগে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৪ শতাংশ বসবাস করে (সারণী-২)। জেলাভিত্তিকভাবে কেবলমাত্র খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাংগামাটি এ ৬টি জেলায় পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার মত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ বনভূমি আছে ; বিভাগভিত্তিকভাবে কোন বিভাগেই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ বনভূমি নেই (সারণি-১)।

দেশের বনাঞ্চলের এই অপ্রতুলতার কারণে উদ্ভূত আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বহুবিধ। সমস্যার উত্তোরণে এগুলোকে ব্যাষ্টিক ও সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সমষ্টিগত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার একটি দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক। ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) বনসম্পদের অবদান ছিল ৫ শতাংশ *(অর্থনৈতিক জরীপ প্রতিবেদন, ১৯৮১, পৃ. ১৯ ও ১৯৮৪, পৃ. ৩১ ;*

FFYP, 1978, পৃ. ১০৫ ; SFYP, 1983, পৃ. ১৪৩ ; চৌধুরী, ১৯৮৮, পৃ. ৬৬)। ১৯৯০ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশে। বৃক্ষরোপণ, গাছকাটা এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে বনাঞ্চলে যেমন বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তেমনি বহুসংখ্যক শ্রমিকের দরকার হয় বনসম্পদ নির্ভর শিল্পগুলোতে। দু'এক দশক আগেও দেশের মোট শিল্প সংক্রান্ত শ্রমিকের শতকরা ১৫ ভাগ নিয়োগকরত শুধুমাত্র অরণ্যসম্পদ নির্ভর শিল্পগুলো *(চৌধুরী, ১৯৮৮, পৃ. ৬৭)*। কিন্তু বনসম্পদের পরিমাণ হ্রাসের সংগে সংগে এই উপখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। বর্তমানে এর পরিমাণ দেশের মোট শ্রমিকের মাত্র ২ শতাংশ *(FFYP, 1990, পৃ. V.E.1)*।

বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলের মাত্র ৬১ শতাংশ এলাকা উৎপাদনশীল বনভূমি হিসেবে বিবেচিত ; বাকী এলাকা জোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম বা তৃণ আচ্ছাদিত অথবা সম্পূর্ণ বিরানভূমি। প্রকৃতি ও অবস্থানভেদে বনভূমির বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ। গুণগত মান বিচারে এসমস্ত এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বনভূমি খুবই নিম্নমানের। বিগত কয়েক দশক ধরে অতিমাত্রায় বনসম্পদ আহরণ এর মূল কারণ। বৃক্ষাচ্ছাদিত বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার তীব্রতা *(FFYP, 1990 পৃ. V.E.1)*। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পললায়ন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বেড়েছে আশংকাজনকভাবে। তুলনামূলক উচ্চভূমিতে অবস্থিত হলেও উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো প্রায়শঃই ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে ; জনজীবন হয়ে উঠছে অতিষ্ট। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। বনভূমি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে ভয়াবহ মরুকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিচ্ছে ; দেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কিছু জেলাতেও (যেমন-যশোর, চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি) মরুকরণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বনসম্পদ ধ্বংসের কারণে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল কমে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত এ দেশ থেকে ২৩টি প্রজাতির বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ; ২৭টি প্রজাতি বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে আছে এবং ৩৯টি প্রজাতির জীবন হুমকির সম্মুখীন *(Nishat, 1993, পৃ. 8)*। বাংলাদেশের যে সমস্ত এলাকাকে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা "মারাত্মকভাবে পরিবেশ অবক্ষিত" বলে চিহ্নিত করেছেন, তার ব্যাপক অংশের পরিবেশ অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে বনোজাড় ও বনসম্পদের অপ্রতুলতা *(Rashid, 1991 ; Nishat, 1993 পৃ. ১৩-১৪)*। এছাড়া প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্যান্য জেলাগুলোতেও নিতান্ত কম নয়। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পঙ্গুত্ব এসমস্ত কারণে বহুলাংশে প্রভাবিত।

সারণি–১ : অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ, ১৯৯১

	বন ভূমির পরিমাণ		
অঞ্চল	একর	বর্গ কি: মি:	মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ (%) *
ঢাকা	২০২১.২৩	৮.১৮	০.৫৮
গাজীপুর	৬২৯৬৫.৫০	২৫৪.৮১	১৪.৪৫
ময়মনসিংহ	৩৮৮২৮.৬৬	১৫৭.১৩	৩.৭৪
টাংগাইল	১২২৭৭৬.০৬	৪৯৬.৮৬	১৪.৬৬
জামালপুর	১০৩৬৪.৩৮	৪১.৯৪	২.০৭
শেরপুর	১৯৪৬৯.১২	৭৮.৭৯	৫.৭০
নেত্রকোনা	২০৭৯.৯৯	৮.৪২	০.২৮
ঢাকা বিভাগ	**২৫৮৫০৪.৯৪**	**১০৪৬.০৮**	**৩.৩৬**
চট্টগ্রাম	৩১৫৬১০.০৮	১২৭৭.২৩	২৫.৮৬
কক্সবাজার	২৪৭৪৮০.৫৩	১০০১.৫২	৪৩.৯৯
বান্দরবন	২৫১৯৭৯.৮৮	১০১৯.৭৩	২২.৩৬
রাংগামাটি	৬৩৮০১২.৫১	২৫৮১.৯৫	৫৮.৪৭
খাগড়াছড়ি	৮৮৪৮৮.৬৫	৩৫৮.১০	১২.৬৫
কুমিল্লা	১৭২০.৯৩	৬.৯৬	০.২৩
নোয়াখালী	৬০১১১.৯৭	২৪৩.২৬	৯.০৪
ফেনী	১৯১.৮৩	০.৭৮	০.০৪
লক্ষ্মীপুর	৪৭৩৫.০০	১৯.১৬	১.১৬
সিলেট	৫১৯০৯.৪৪	২১০.০৭	৬.২৪
হবিগঞ্জ	৩৭৬৪৯.৬৭	১৫২.৩৬	৫.৯১
মৌলভীবাজার	৭০৬৮৩.১৭	২৮৬.০৫	১০.৫৯
সুনামগঞ্জ	২৬৪৭১.৪৪	১০৭.১৩	২.৮৬
চট্টগ্রাম বিভাগ	**১৭৯৫০৪৫.১০**	**৭২৬৪.৩০**	**১৫.৪৫**
খুলনা	৩৫৭৩৯৯.৮৬	১৪৪৬.৩৫	৩৩.১৬
সাতক্ষীরা	৪০০৯৬৪.৮৩	১৬২২.৬৫	৪৩.৩০
বাগেরহাট	৬৬৮৪৩০.০০	২৭০৫.২৫	৬৯.৬৭
পটুয়াখালী	২৬৭৯০.৭৯	১০৮.৪২	২.৫০
বরগুনা	২৮৭৮০.৯৪	১১৬.৪৭	১০.৫৭
ভোলা	৪১৪৯৫.৪৬	১৪৭.৯৩	৫.৬৩
পিরোজপুর	১৩১২.০০	৫.৩১	০.৩৮
খুলনা বিভাগ	**১৮৯৮৬৭৪৬.১০**	**৭৬৮৩.৬৮**	**২১.৫০**
দিনাজপুর	১৮৬৯১.০১	৭৫.৬৪	২.১৩
ঠাকুরগাঁও	১৯৬৮.৭৪	৭.৯৭	০.৪৪
পঞ্চগড়	৪৬৯৫.৮৬	১৯.০০	১.৩৫
নওগাঁ	৭০১০.৬৪	২৮.৩৭	০.৮৩
রংপুর	৩৪১৯.৬৯	১৩.৮৪	০.৬০
নীলফামারী	২৭১৮.৭৭	১১.০০	০.৬৭
কুঁড়িগ্রাম	৫৩.০৩	০.২১	০.০১
লালমনিরহাট	৮৪.৬৩	০.৩৪	০.০৩
গাইবান্ধা	১.৮৫	০.০১	০.০০
রাজশাহী বিভাগ	**৩৮৬৪৪.২২**	**১৫৬.৩৯**	**০.৪৫**
বাংলাদেশ	**৩৬১৭৩৬৮.৪৮**	**১৪৬৩৮.৯৯**	**৯.৮৭**

উৎস : The Task Forces Report, Vol. Four, 1991.

** পরিসংখ্যান মোতাবেক হিসাবকৃত।*

সারণি-২ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও বনভূমির আঞ্চলিক বন্টন (শতাংশে), ১৯৮৮

অঞ্চল	জনসংখ্যা (%)	বনভূমির পরিমাণ (%)
রাজশাহী বিভাগ	২৪	২
ঢাকা বিভাগ	৩০	৭
খুলনা বিভাগ	২০	৪২
চট্টগ্রাম বিভাগ	২৬	৪৯
মোট	**১০০**	**১০০**

উৎসঃ হোসেন, এম. মোজাম্মেল : বাংলাদেশের বনসম্পদ, জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা, একটি গবেষণা (মিমিও), ১৯৯০, পৃ. ৫।

ব্যাষ্টিক দৃষ্টিকোণ বিচারে প্রকৃতি ও অবস্থানভেদে (সংযোজনী-১) বনভূমির বিচিত্রধর্মী সমস্যা বিদ্যমান। অঞ্চল ও অবস্থান ভিত্তিক সমস্যার কিছু পূর্বেই চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে বনের প্রকৃতিভিত্তিক সমস্যাবলী সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হলো :

পাহাড়ী বন

পাহাড়ী বনভূমির মোট আয়তনের ৭০ শতাংশ মাত্র বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং এরও বেশ কিছুটা নিম্নমানের। প্রজাতিগত দিক থেকে এগুলো দীর্ঘমেয়াদী আবর্তক জাতের এবং কৃত্রিম পুর্নজন্ম অনুস্মরণের মাধ্যমে "ক্লিয়ার ফেলিং" প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপিত হয়। অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি পার্বত্য জেলাগুলোতে অবস্থিত। স্মরণাতীতকাল থেকে অনিয়ন্ত্রিত ঝুমচাষের ফলে এতদাঞ্চলের বনভূমি সম্পূর্ণ বৃক্ষবিহীন হয়ে পড়েছে *(Ali 1990, পৃ. 8)*; ভূমিক্ষয়ের হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্রভাবে। ফলতঃ সম্পূর্ণ এলাকাটি পরিণত হয়েছে একটি অনুৎপাদনশীল ভূমিতে ; ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের কারণে এলাকার নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে ; প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে বনসম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এবং দেশের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন উৎস কাপ্তাই হ্রদের আয়ুস্কাল সীমিত হয়ে আসছে *(হোসেন, ১৯৯০, পৃ. ৩)*।

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন

আর্থিক দিক থেকে প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অরণ্য। এই বনাঞ্চলের প্রধান প্রধান প্রজাতিসমূহ যেমন, সুন্দরীবৃক্ষ তারবার্তা, বিদ্যুৎবাহী তার ও ঘরের খুঁটি এবং নৌকা তৈরীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ; শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গেওয়া, পেন্সিল তৈরীর জন্য ধুন্দল এবং চামড়া পাকা করার জন্য গরান বৃক্ষের বাকলজাত কষ বা ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। প্রজাতিভেদে এসকল বৃক্ষের বিচিত্রধর্মী বৈশিষ্ট বিদ্যমান। সুন্দরীবৃক্ষ মৃত্তিকার শুষ্কতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারেনা *(Ahmed, 1959, পৃ. ১৭-১৮)* ; গেওয়াবৃক্ষ শুষ্কতার প্রতি অপেক্ষাকৃত

সহনশীল। ফাংগাস আক্রমণ *(Ahmed, 1959, পৃ. ২০)* এবং "মাথা মরা" *(FFYP, 1990, পৃ. V. E. 9)* সুন্দরীবৃক্ষের জন্য একটি ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এতে প্রাকৃতিক পুর্নজন্ম প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। শতাব্দিকাল থেকেই ব্যাপক এলাকা জুড়ে বছরের পর বছর অনাবৃত এলাকায় বনসৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না *(Curtis, 1933, পৃ. ১৮ ও FFYP 1990-95, পৃ. V. E. 9)*। বিগত ২৪ বছরে সুন্দরী ও গেওয়া প্রজাতির সম্পদের পরিমাণ কমেছে যথাক্রমে ৪০ ও ৪৫ শতাংশ ; সামগ্রিকভাবে এই বনাঞ্চল উজাড় হয়েছে ২৩ শতাংশ। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে যে, সুন্দরবন এলাকার ৬৫ শতাংশ বনভূমির ৭০ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত, ৩০ শতাংশ এলাকার বনভূমি ৩০ থেকে ৭০ শতাংশের কম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং ৫ শতাংশ এলাকার বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ৩০ শতাংশের কম *(Ali, 1990, পৃ. ৬)*। ম্যানগ্রোভ বনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু চকোরিয়া সুন্দরবন বা উপকূলীয় বনাঞ্চল। বিগত ২৫ বছরে এর ৪৩ শতাংশ বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অতিরিক্ত বনাহরণ, চিংড়ি চাষ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অন্যান্য নানা কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জোয়ারের স্তর হ্রাস, ঘন ঘন প্লাবন ইত্যাদি এই বনোজাড়ের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। উপকূলীয় অঞ্চলে বনোজাড়ের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসজনিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ অঞ্চলে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে সামুদ্রিক ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন *(মাসুদ, ১৯৯৩ পৃ. ৫)*।

সমতল এলাকার শালবন

সমতল এলাকার শালবনের অবস্থা আরো করুণ ও নিম্নমানের। এ এলাকার বনভূমির মাত্র ৩২ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত *(Ali, 1990, পৃ. ৮)*। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্যাপক আকারে অসদুপায়ে বনোৎসাদন চলে। ইতোমধ্যে এই বনের ৯৫ হাজার ৫ শত ৫৬ একর এলাকা বেদখল হয়ে গেছে। এ অবস্থা নিরসনে সরকার ১৯৭২ সালে সকল প্রকার সরকারী বনভূমি থেকে বনোৎসাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তবে এ জাতীয় ঘোষণা কোন কাজে আসেনি *(FFYP, 1990, পৃ. V. E. 2)*। স্থানীয় ক্ষমতাশীল ও লোভী লোকের হাতে এর পরেও চলেছে বনের অননুমোদিত নিধনযজ্ঞ। বর্তমানে সমতল এলাকার শালবনের মাত্র ৩০ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত *(FFYP, 199, পৃ. V. E. 2)*।

গ্রামীণ বন

কুটির শিল্প ও ছোট ছোট কাঠভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের যোগান দিতে গিয়ে গ্রামীণ বন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশের সামগ্রিক জ্বালানী সংকটের কারণে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ বনোজাড় চলছে। ফলে ভূমি ও প্রকৃতির মধ্যে মারাত্মক প্রতিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করছে *(তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন, ১৯৮৩, পৃ. ২১৯)*।

বনসম্পদের চাহিদা ও যোগান

বনজ সামগ্রীর ৮০ শতাংশ জ্বালানী কাঠরূপেই ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুসারে, বনজ সামগ্রী দেশের প্রচলিত জ্বালানীর ৭৫ শতাংশেরও বেশী জ্বালানী ব্যবহারের যোগান দেয়। অবশ্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন মতে, উক্ত খাতে বনসম্পদের অবদান মাত্র ১৭ শতাংশ এবং বাদবাকী আসে কৃষিজ আবর্জনা, খড়কুটা, গোবর ইত্যাদি থেকে। কেউ কেউ মনে করেন, প্রচলিত জ্বালানীর ক্ষেত্রে বনসম্পদের অবদান ২০ শতাংশ এবং সম্পূর্ণ জ্বালানী কাঠের ৬৯ শতাংশ ব্যবহৃত হয় রান্নার কাজে, ২৩ শতাংশ ইটের ভাটায় এবং ৮ শতাংশ শিল্পজ্বালানী হিসেবে *(Ali, 1990, পৃ. ১৩)*।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মতে, দেশের বর্তমান কাঠ ও জ্বালানী কাঠের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ০.৩৮ ও ২.৩০ ঘনফুট। অথচ একই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত নেপাল ও বার্মার ব্যবহার প্রায় ২০ ঘনফুট *(SFYP, 1983, পৃ. ১৪২)*। ১৯৮৫–৮৬ সালের হিসেব মতে, দেশে কাঠ ও জ্বালানী কাঠের ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৩৮ ও ২৩০ মিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভুমি থেকে যথাক্রমে ১৩.৩ ও ২৫.৫ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ ও জ্বালানী কাঠ সরবারহ করা হয়েছে। বাকী ২৪.৭ ও ২০৪.৫ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ ও জ্বালানী কাঠের সরবরাহ হয়েছে গ্রামীণ বন থেকে। দেশের মোট বনভূমির মাত্র ১১ শতাংশ গ্রামীণ বন হিসেবে বিবেচিত *(FFYP, 1990, পৃ. V. E. 1)*। অথচ এখান থেকেই সামগ্রিকভাবে দেশে ব্যবহৃত কাঠের প্রায় ৭০ শতাংশ এবং জ্বালানীকাঠ ও বাঁশের প্রায় ৯০ শতাংশ সরবরাহ পাওয়া যায় *(তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন, ১৯৮৩ পৃ. ২১৯)*। কিন্তু প্রতিবছর যে হারে গ্রামীণ বন উৎসাদিত হচ্ছে পুনর্জন্ম ক্ষমতা তার তুলনায় অনেক কম। এ কথাটি যে শুধুমাত্র গ্রামীণ বনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা' নয়, বরং তা' সামগ্রিকভাবে দেশের সকল বনাঞ্চলের জন্যই একটি নির্মম সত্য।

সবচেয়ে আশংকাজনক বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় বনসম্পদের সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের মধ্যে। দেশের বনসম্পদের পরিমাণ কমছে দ্রুতহারে ; বন এলাকার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে পড়ে থাকছে। কিন্তু, অন্যদিকে মানুষের চাহিদার পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা থেকে সতত: ঊর্ধ্বগামী *(MTR-TFYP, 1989, পৃ. ৯৫)*। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে দেশের প্রয়োজনীয় কাঠ ও জ্বালানী কাঠের চাহিদা যোগানের ব্যবধান যথাক্রমে ২৬.১২ ও ১২৯.৯১ মিলিয়ন ঘনফুট। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও ভোগস্তর বর্তমান অবস্থায় স্থির থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ এ ব্যবধান যথাক্রমে ২৮.২ ও ১৪৫.২ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবে (সারণী–৩)। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে সীমিত বনভূমি, জনসংখ্যার অত্যাধিক চাপ, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন, শতবর্ষের পুরানো বন–আইনের দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অব্যবস্থা।

সারণি–৩ : কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে বনসম্পদের চাহিদা ও যোগান, ১৯৯০

	কাঠ (মি: ঘনফুট)	জ্বালানী কাঠ (মি: ঘনফুট)	২০০০ হাজার সাল নাগাদ অবস্থা (মি: ঘনফুট)	
			কাঠ	জ্বালানী কাঠ
চাহিদা	৪৬.৬০	২৭৯.৫৮	৫০.০	৩০৪.০
যোগান	২০.৪৭	১৪৯.৬৭	২১.৮	১৫৮.৮
ঘাটতি	**২৬.১২**	**১২৯.৯১**	**২৮.২**	**১৪৫.২**

উৎস: *Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with special reference to Demand and Supply of Fuelwood : a research mimio, BARC, Dhaka. 1990, p. 13.*

বাংলাদেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ ও বনায়ন : সফলতা এবং ব্যর্থতা

অতীতের পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উচ্চাভিলাস ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যর্থতাই হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট। এই ব্যর্থতার জন্য যে কারণগুলোকে দায়ী করা হয়েছে তার স্বরূপও সকল ক্ষেত্রে মোটামুটি একই।

পরিকল্পনার আওতাধীনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। মূলত: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকেই বনসম্পদ উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়। তবু প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা দু'টি ছিল অনেকটা ঔপনিবেশিক চেতনা লালিত। এ সময় বনসম্পদ উন্নয়ন থেকে সর্বোচ্চমাত্রায় বনসম্পদ আহরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে *(তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন, ১৯৮৩, পৃ. ২১০–২১৭)।* বনভূমি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ ও প্রয়োজনীয় জমির স্বল্পতার বিষয়টি দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় থেকে সর্বাধিক অনুভূত হয়। সে জন্য তখন থেকেই গ্রামীণ বনোন্নয়নের ওপর দৃষ্টি দেয়া হয়। মধ্য পর্যায়ে এসে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোর বনহীনতার প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে একটি ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে এটি সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি (১৯৮২–১৯৮৭) নামে সারাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ বনায়ন কর্মসূচি বিশেষ গতি পায় এবং একই সঙ্গে সংযোজিত হয় উপজেলা বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প (১৯৮৮–১৯৯৪), গুচ্ছগ্রাম ও বনায়ন এবং এনজিও–এর মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনায়ন। বিগত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতাধীনে গৃহীত অসংখ্য প্রকল্পের মধ্যে উল্লিখিত প্রকল্পগুলো অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং সর্বাধিক আলোচিত। এর মধ্যে এনজিও–এর মাধ্যমে গৃহীত বনায়ন কর্মসূচি যথেষ্ট ফলপ্রসু বলে অনেকে মনে করেন। তবে সামগ্রিক বিচারে এনজিও'র মাধ্যমে গৃহীত বনায়ন কর্মসূচির ফলপ্রসুতার বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়।

বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে ব্যাপৃত। ব্যাপক স্থানিক পরিসরে কর্মসূচি পরিচালনা করার মত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কোন এনজিও'র নেই। তাই এনজিও'রা স্বল্প পরিসরে ভাল ফলাফল দেখাতে পারলেও বৃহত্তর পরিসরে সরকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে তুলনামূলকভাবে কম ফলপ্রসু ; তুলনামূলক বৃহত্তর পরিসরে কার্যরত এনজিও'গুলোর অবস্থা থেকে অন্তত তাই মনে হয়—সাধারণত অনেকে এমন ধারণা পোষণ করেন। আবার অনেকের মতে, যে অর্থ ও লোকবল দিয়ে এনজিও'গুলো বনায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে তা' আপাতফলপ্রসু মনে হলেও কার্যত অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। তবে তুলনামূলক বিচারে বন অধিদপ্তর থেকে অধিক অর্থ ও লোকবলের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করলেও তাদের কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অধিকতর নিশ্চিত হয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। ইদানিং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বনায়নও জনমনে বেশ সাড়া যোগাচ্ছে। নিম্নে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামাগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চিত্র তুলে ধরা হলো :

সারণি-৪ : বিভিন্ন এলাকার বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কর্মসূচির অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা, ১৯৭৩-৯০

বৃক্ষায়ণ/বনায়নের ধরণ	দ্বিবার্ষিকসহ ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৮০) (হেক্টর)	২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) (হেক্টর)	৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)	৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (হেক্টর)	(%)
১। কর্তিত প্রাকৃতিক পাহাড়ী বনাঞ্চলে পূণঃবৃক্ষরোপণ	২১,৭২৩	২৬,৮৮৩	৩০,৩৬০	১৮,১৭৩	৬০
২। ক্ষয়িষ্ণু ও অনাবৃত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বনায়ন	৬,৭৬১	১১,৮৮৬	৩৬,০০০	২,৩৭৬	৭
৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমিতে বনায়ন	৮,৪৪৬	১৭,৯৯৬	২৯,১৫০	১০,৭২১	৩৭
৪। উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জেগে ওঠা ভূমিতে বনায়ন	৩০,৯৮২	৪০,৪১৫	৪০,৪৮৫	৩২,৫৫৩	৮০
৫। Woodlot & Agroforestry Plantation	—	২,৯৩২	১৫,৬২৮	৫,৪১৩	৩৫
৬। Strip Plantation (Km)	—	৩,৪১০	৪,৯৮০	৪,২৪১	৮৫
৭। **চারা বিতরণ** (mln)	২৬.৭	২১	৭৬	৪২	৫৫

উৎস : *The Fourth Five Year Plan 1990-95, p. V. E. 2.*

এযাবতকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উপকূলীয় বনায়ন ও strip plantations সর্বাধিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যার পরিমাণ যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ শতাংশ (সারণী–৪)। সাম্প্রতিককালের এক জরীপে দেখা গেছে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে রোপিত বৃক্ষের প্রায় ৭০ শতাংশ বেঁচে উঠেছে। এতদাঞ্চলের প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে "কাণ্ড–খোঁড়ক" কীটের আক্রমণ। রোপিত বৃক্ষের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ এই আক্রমণের শিকার। তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্তিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি মাত্র ৬০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যা দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় অনেক কম। ক্ষয়িষ্ণু ও অনাবৃত বনাঞ্চলের বৃক্ষায়ন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রায় শূন্যের কোটায় (৭ শতাংশ)। "প্রজাতি–স্থানের" উপযুক্ততা নির্ধারণের ব্যর্থতাই এ সকল ক্ষেত্রে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। বৃক্ষায়ণে অসঙ্গত প্রজাতির মিশ্রণ ও দ্রুতবর্ধনশীল একক প্রজাতির বৃক্ষায়ণও ব্যর্থতার আর একটি প্রধান কারণ। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে, একক প্রজাতির বৃক্ষশিশু অতিমাত্রায় পোকার আক্রমণের শিকার হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রোগাক্রমণ, নিম্নমানের চারা ও বীজ, রোপণোত্তর পরিচর্যার অভাব ও প্রশাসনিক অদক্ষতা অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

বন প্রশাসন ও বন ব্যবস্থাপনা

একটি সুষ্ঠু বন প্রশাসন ও বন ব্যবস্থাপনার দু'টি মৌলিক দিক হচ্ছে যুগোপযোগী আইনের ভিত্তি তৈরী এবং আইন প্রয়োগের জন্য একটি সুব্যবস্থিত, দক্ষ ও কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ই দীর্ঘ দিনের একটি অবহেলিত অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

১৯৮৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত বন–আইন ছিল ভূতপূর্ব বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত, যার মৌলিক ধারা ছিল নির্বিচারে বনোজাড়ের মধ্য দিয়ে কৃষির পত্তন ঘটানো এবং বনভূমি থেকে সর্বোচ্চমাত্রায় সম্পদ আহরণ। ১৯৮৯ সালেই প্রথমবারের মত প্রচলিত বন–আইন সংশোধনীর প্রয়াস নেয়া হয়। বিশেষজ্ঞমহলের অনেকেরই ধারণা, সংশোধিত এই বন–আইনটিও অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টতার অভাবদোষে দুষ্ট। এছাড়া অনুভূত প্রয়োজনের আলোকে সময়ে সময়ে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ এবং সামাগ্রিকভাবে সংশোধিত এই বন–আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এ অভিযোগ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ছাড়াও সকরারী দলিলপত্রেও স্বীকৃত *(FFYP, 1990, পৃ. V. E. 2)*। উদাহরণত ১৯৮৯ সালে ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু সারাদেশে এ আইনটি লঙ্ঘিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে *(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৯১, পৃ. ৬)*। তবে, শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। কোন আইন প্রণয়ন করার পূর্বে আইনের প্রয়োগযোগ্যতা ও প্রয়োগ কৌশলের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি, জনগণের হাতে বিকল্প কিছু তুলে দিতে না পারলে এ জাতীয় আইন

বাস্তবত: কখনোই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। জনগণের মধ্যে বন-আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি-প্রবিধি সংক্রান্ত অজ্ঞতাও অপরিকল্পিত এবং অননুমোদিত বনোৎসাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞমহলের অনেক অভিযোগ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দূর্নীতিপরায়ণতা, দায়িত্বহীনতা, লোভী ও অসাধু ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের সাথে যোগসাজস রক্ষা করে চলা ইত্যাদি অন্যতম *(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৯১, পৃ. ৩ ও ৬)*। এগুলো কঠোর হস্তে দমন করা না গেলে বিদ্যমান সমস্যার উত্তরণ বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন মতে, বন বিভাগের বৃক্ষায়ণ প্রক্রিয়া খুবই অপ্রতুল। রোপণোত্তর পরিচর্যার অভাবে বেশীর ভাগ গাছই মারা যাচ্ছে এবং এগুলোর প্রতিস্থাপন হচ্ছে না। বন বিভাগ, বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সীর মধ্যে কোন কার্যকরী সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। পরিবেশ নীতিতে জ্বালানী, বন, বন্য প্রাণী ও জৈব বৈচিত্র খাতের নীতিসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্ধারণ অধিকতর প্রয়োগযোগ্য হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং এ সকল সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যাপক প্রয়াস আবশ্যক। গবেষণার সাথে বাস্তব প্রয়োজনের তেমন কোন মিল নেই। আশির দশকে বন বিভাগকে পূণর্গঠনের প্রয়াস নেয়া হলেও তা বিশেষ কোন উপকারে আসেনি *(FFYP, 1990, পৃ. ৪-৫)*। সত্তরের দশকে সুইডিশ আর্থিক সহযোগিতায় বন বিভাগের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও পরবর্তীতে কার্যত অর্থের অভাবে সেটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন উপখাতে ৮৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটাই এই উপখাতে এ যাবতকালের সর্বাধিক বরাদ্দ। পরিকল্পনায় দেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের পুনর্বিন্যস্তকরণ, সমন্বয় ইত্যাদি পদক্ষেপের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, তুলনামূলক বিচারে আমাদের দেশের প্রশাসনিক উপরি কাঠামো (অর্থাৎ লিখিত নীতিমালা, পরিকল্পনা, প্রণীত আইন ও প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি) দৃশ্যত অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু ভেতর কাঠামো (অর্থাৎ বাস্তবায়ন, জবাবদিহিতা, সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও পদায়ন ইত্যাদি) অত্যন্ত দুর্বল ও যথার্থ কার্যকরী নয়। এর গোড়ায় হাত দেয়া না গেলে সমস্যার উত্তরণগতি শ্লথ হতে বাধ্য।

গৃহীতব্য ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

দেশের বনসম্পদের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক অপ্রতিরোধ্য আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অবশ্য চলতি অবস্থা বিরাজ করলে বর্তমান প্রজন্মও এ হুমকির বাইরে নয়। এ সমস্যার উত্তরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

কাঠ ও জ্বালানী কাঠের ব্যবহার কমানোর পদক্ষেপসমূহ

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সলিড কাঠের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে বিকল্প দ্রব্যাদি যেমন পারটেক্স ইত্যাদির ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে হবে এবং জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে জনসাধারণের মাঝে সলিড কাঠের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে।
- কাঠ আহরণ ও চেলাইকরণের সময় প্রচুর কাঠ নষ্ট হয়। এ সমস্যার সমাধানে আহরণ ও চেলাইকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পসময়ে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কাঠ ব্যবসায়ীরা কাঠকে প্রক্রিয়াজাত করেনা। দীর্ঘায়ূ করার জন্য কাঠ ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- ১৯৮৯ সাল থেকে ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- জ্বালানীকাঠের বিকল্প উৎস, যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য লাগসই বিকল্পের ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে হবে।

বনায়নের পদক্ষেপসমূহ

দেশের বর্তমান আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে পর্যাপ্ত বনায়ন অতীব জরুরী এবং এই বনায়ন প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ভিত্তিক ও পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত হতে হবে। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক :

- যে সকল এলাকায় বনায়নের সুযোগ রয়েছে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন করা।
- বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির অনাবৃত এলাকায় সুষ্ঠু পুনর্জন্ম ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে "স্থান-প্রজাতি"র যথোপযুক্ততা যাচাই ও রোপণযোগ্য বিভিন্ন "প্রজাতির সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ" ব্যবহার করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।
- উপকূলীয় বনায়নের ওপর আরো জোর দিতে হবে। সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রতিরোধে স্থানীয় প্রকৃতির

বনায়নের সাথে উপকূলের সম্মুখভাগে নারিকেল, খেজুর, তাল জাতীয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত "গ্রীণ বেল্ট" সৃষ্টি করতে হবে।

- জ্বালানীকাঠের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ আকারে স্বল্পমেয়াদী আবর্তক জাতের বৃক্ষ বা দ্রুতবর্ধনশীল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত অনাবৃত বনাঞ্চলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে এ জাতীয় বৃক্ষায়ণ করা যেতে পারে।

- গ্রামীণ বনায়ন প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করতে হবে এবং সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

- সম্ভাব্য শীঘ্র একটি পূর্ণাঙ্গ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়াস নিতে হবে এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

ব্যক্তিগত, সামাজিক সংগঠন বা সরকারী উদ্যোগ—যেভাবেই বনায়নের পদক্ষেপ নেয়া হোক না কেন, বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমি ছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে যেমন বসতির আশে-পাশে, যোগাযোগ পথের দু'ধারে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অনাবাদী জমিতে বৃক্ষায়ণ সম্ভব। শহরাঞ্চলের বনায়ন প্রক্রিয়ায় একটি ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। শহর ও নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় বনায়ন পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা আবশ্যক *(Mueller, 1970, পৃ. ৬৩)*, যা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রধানত অনুপস্থিত। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শহর ও নগর বসতির ধরণ, ভূমিমূল্য ও ভূমির অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করে শহরাঞ্চলে একটি কার্যকরী বনায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে।

(ক) দ্বীপাকার পদ্ধতির বনায়ন

ঘনসন্নিবিষ্ট জনবসতি, ভূমির অপ্রতুলতা, অত্যাধিক ভূমিমূল্য ইত্যাদি কারণে দেশের বড় বড় নগরী ও শহরগুলোতে নতুনভাবে পরিকল্পিত উপায়ে বনায়ন করা খুবই দূরূহ এবং শহরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রয়োজনীয় বনায়ন এক্ষেত্রে অসম্ভব। সেজন্য দ্বীপাকার পদ্ধতির বনায়ন (চিত্র-১) এসমস্ত এলাকার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। শহরের বিভিন্ন স্থানে বসতির আশে-পাশের খালি জায়গায়, যোগাযোগ পথকে ঘিরে অথবা উদ্যান কৃষি হিসেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের আকারে এজাতীয় বনভূমি গড়ে উঠতে পারে। এজাতীয় বনায়নের অসুবিধা হচ্ছে, এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে তা' পর্যাপ্ত অবদান রাখতে সক্ষম নয়। তবু বিকল্প বনায়ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে এক্ষেত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিই সার্বিক দিক বিবেচনায় যথোপযুক্ত।

(খ) সবুজ রিং-আকার পদ্ধতির বনায়ন

সাধারণত বসতিকে রিং-এর আকারে ঘিরে এজাতীয় বনভূমি গড়ে ওঠে এবং একটি শহর বসতিতে স্তরাকারে কয়েকটি রিং থাকতে পারে (চিত্র-২)। দেশের ছোট ছোট শহরগুলোতে যেমন থানা শহর ও নব্য পরিকল্পিত শহরগুলোতে এজাতীয় বনায়ন করা যেতে পারে। দ্বীপাকার বনভূমির তুলনায় এর সুবিধা অনেক বেশী। এক্ষেত্রে বনভূমি বসতিকে রিং-এর আকারে ঘিরে থাকে বলে বায়ুশোধন প্রক্রিয়ায় এটি একটি নিবিড় ফিল্টারের কাজ করে।

চিত্র ১-৬ ঃ বনায়ন পদ্ধতি

চিত্র-১ ঃ দ্বীপাকার পদ্ধতি

চিত্র-২ ঃ সবুজ রিং-আকার পদ্ধতি

চিত্র-৩ ঃ সবুজ আঙ্গুলাকার পদ্ধতি

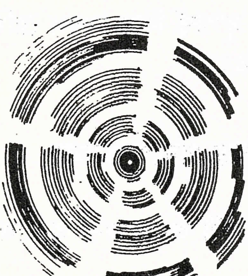

চিত্র-৪ ঃ সমন্বিত সবুজ রিং-আকার ও সবুজ আঙ্গুলাকার পদ্ধতি

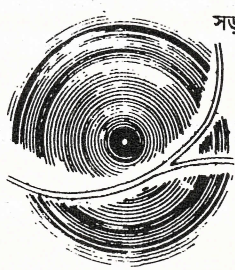

চিত্র-৫ ঃ বক্ররৈখিক সবুজ চত্বর

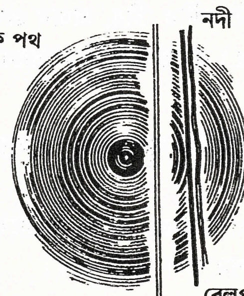

চিত্র-৬ ঃ সরলরৈখিক সবুজ চত্বর

বসতি অঞ্চল

বনভূমি

উৎস : *Barner Joerg. : Experimentelle Landschaftsoekologie : Lehrbuch der Umweltforschung. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1983, p. 87.*

(গ) আঙ্গুলাকার পদ্ধতির বনায়ন

এ পদ্ধতিটিও নব্য পরিকল্পিত এবং থানা শহরগুলোর জন্য বিশেষ উপযোগী। শহর কেন্দ্র থেকে শহরতলীর দিকে আঙ্গুলের মত বর্ধিত থাকে বলে একে আঙ্গুলাকার বনায়ন পদ্ধতি বলা হয় (চিত্র–৩)। আবার দৃশ্যত: কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির মত দেখায় বলে একে "বিচ্ছুরিত সবুজ চত্বর" এবং কখনো কখনো "সবুজ করিডোর" বলা হয়। এজাতীয় বনভূমি শহরাভ্যন্তর ও বহির্ভাগের মুক্ত ভূমির মধ্যে বায়ুর আদান-প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং শহর এলাকার বায়ু শোধন করে।

(ঘ) সমন্বিত রিং–আকার ও আঙ্গুলাকার বনায়ন পদ্ধতি

এই সমন্বিত পদ্ধতিটি (চিত্র–৪) হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি শহরের সর্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর বায়ু ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সবুজ রিংগুলো বায়ু বিশুদ্ধকরণ ছাক্‌নীর কাজ করে এবং বিচ্ছুরিত সবুজ চত্বরগুলো শহরে স্বচ্ছন্দ বাতাস আগমন–নির্গমনের করিডোর হিসাবে কাজ করে। এছাড়া এ পদ্ধতির বনায়নের মাধ্যমে শহরের পরিবেশ, প্রতিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত অন্যান্য উপাদানগুলোও নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দেশের নব্য পরিকল্পিত ও থানা শহরগুলোতে এজাতীয় বনায়ন করা যেতে পারে।

(ঙ) সরলরৈখিক ও বক্ররৈখিক সবুজ চত্বর

অনেক সময় শহরাঞ্চলে বনায়নের জন্য পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকেনা। এজন্য পূর্বালোচিত পদ্ধতি অনুসরণে বনায়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু এ সকল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর তীর, প্রধান প্রধান সড়ক বা রেললাইনের দু'পার্শ্ব দিয়ে 'সরল রৈখিক' (চিত্র–৫) বা 'বক্র রৈখিক' ভাবে (চিত্র–৬) বন সৃষ্টি করা যায়।

সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ

- প্রশাসনের ভেতর কাঠামো শক্তিশালী ও যথার্থ কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বন–আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সংশোধিত বন–আইনে (১৯৮৯) এগুলোর সংযোজন ঘটাতে হবে। জনসাধারণের মাঝে বন–আইনের স্বচ্ছতা আনায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- অসদুপায় ও অননুমোদিত বনোৎসাদনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

- বৃক্ষের রোপণোত্তর পরিচর্যা ব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে ও তার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।
- গৃহীত প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনের সময় অর্থাভাবে যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অবমুক্তি প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহসহ সামগ্রিক কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়নের ওপর অধিকতর জোর দিতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বনোন্নয়ন যতটা না অর্থনৈতিক কারণে জরুরী তার থেকেও বেশী জরুরী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে। তবে দেশের অর্থনীতিতে এই উপখাতের অবদানও নিতান্ত অবহেলারযোগ্য নয়। ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে এই উপখাতের প্রত্যক্ষ অবদানের চেয়ে পরোক্ষ অবদানের সম্ভাবনাই বেশী। একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে বনসম্পদ একরকম অণুঘটকের ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনীয় মাত্রায় বনোন্নয়ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে যেমন সমৃদ্ধির সোপান সৃষ্টি করে, তেমনি এর অপ্রতুলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সে কারণে বনসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অতীব জরুরী। তবে, আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এককভাবে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি, সংগঠন বা সরকারের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ দায়িত্ব আমাদের সকলের, সমগ্র জাতির।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১ Ahmed, Nafis and Khan, Fazle Karim, : The Sundarban Forests of East Pakistan : a Resource Appraisal, Oriental Geographer, Dhaka, July 1959.

২ Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood. a research minio, BARC, Dhaka, 1990.

৩ Barner, J : Experimentelle Landschaftsoekologie : Lehrbuch der Umweltforschung. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1983.

৪ Curtis, S. J. : Working Plan for the Forests of the Sundarban Division. Vol. 1 Part 1, Calcutta, 1933.

৫ Geiger, R. : Klima der bodennahen Luftschicht. Vieweg, Braunschweig, 1961.

৬ Government of the People's Republic of Bangladesh. : The First Two Year Plan, 1978-80. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1978.

৭ Government of the People's Republic of Bangladesh : The Second Five Year Plan, 1980-85, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1983.

৮ Government of the People's Repulbic of Bangladesh : The Mid-Term Review of the Third Five Year Plan, 1985-90 . Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1989.

৯ Government of the People's Republic of Bangladesh. : The Fourth Five Year Plan, 1990-95. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990.

১০ Government of the People's Republic of Bangladesh. : National Conservation Strategy of Bangladesh---Towards Sustainable Development ; Ministry of Environment and Forest, Dhaka, 1991.

১১ Haupt, R. : Beitrag zum Problem der Laermminderung durch Waldbestaende. Archiv fuer Naturschutz and Landschaftsforschung, Heft 13/14, 1973/94.

১২ Miess, M. : Umweltoekologische Aspekte staetischer Siedlungsraeume. In : Meyer, F. H. : Baeume in der Stadt ; Ulmer, Stuttgart, 1978.

১৩ Mueller, W. : Staedtebau. Teubner, Stuttgart. 1970.

১৪ Nishat, Ainun. : Key Issues of Environmental Concern for Bangladesh ; Seminar Paper, BPATC, Savar, Dhaka, 1993.

১৫ Rashid, Harun Er. : Geography of Bangladesh. University Press Ltd., Dhaka, Bangladesh, 1977.

১৬ Rashid, Harun Er. : Geography of Bangladesh. University Press Ltd., Dhaka, Bangladesh, 1991.

১৭ The World Bank : Indonesia : Sustainable Development of Forests, Land and Water, a World Bank country study, Washington D. C., 1990.

১৮ Zellentin, Gerda : Oekologie und Oekonomie in europaeischer Dimension : Moeglichkeiten und Grenzen einer Umweltpolitik der Europaeischen Gemeinschaft. In : Europaeische Themen im Unterricht, Bundeszentrale fuer politische Bildung, Band 254, 1987.

১৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৮০-৮১.

২০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৮৩-৮৪.

২১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮৫-৯০. পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৩।

২২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম ; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯২।

২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশের পরিবেশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর ; পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা, ১৯৯০।

২৪ চট্টগ্রামের কাঠচোরদের দৌরাত্ত : সরকারী বনাঞ্চল উজাড়. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩.০৯.১৯৯১ ইং।

২৫ চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম : আর্থনীতিক ভূগোল : বাংলাদেশ ও বিশ্ব. দি সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৮।

২৬ মণ্ডল, দীপংকর ও খান, মোর্শেদুল আনোয়ার : বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন ; দ্বাদশ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত সেমিনার প্রবন্ধ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৭ মাসুদ, আলম : বাংলাদেশের বিপর্যস্তকর পরিবেশ : প্রধান ইস্যুসমূহ : পরিবেশ ও আমরা, পরিবেশ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৩।

২৮ সিদ্দিকী, গিয়াস : সবুজ স্বর্ণ : বনদস্যুদের তৎপরতা ; পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৯ হোসেন, এম মোজাম্মেল : বাংলাদেশের বনসম্পদ, জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা. একটি গবেষণা মিমিও, ১৯৯০।

সংযোজনী-১ : প্রকৃতি অনুসারে বনের শ্রেণীবিন্যাস, অবস্থান ও সম্পদের পরিমাণ, ১৯৯০

বনের শ্রেণী	অবস্থান	প্রধান জাতসমূহ	এলাকার পরিমাণ (মিঃ একর)	সম্পদের পরিমাণ (মিঃ ঘনফুট)
১। পাহাড়ী বন	বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলা	গরান, চাপালিকা, সিভিট, চম্পা, তেলসুর, গামার, তুন ঢেঁকিজাম, কড়ই, টিক, প্রভৃতি	১.৬৫	১,১৬৫.২০
২ক। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	বৃহত্তর খুলনা ও পটুয়াখালী জেলা	সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, বিন, গরান, পশুর, গোলপাতা প্রভৃতি	১.৪৬	৪৮৯.৬১
২খ। উপকূলীয় বন	বৃহত্তর পটুয়াখালী, এবং চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় অঞ্চল	কেওড়া ও বিন	০.৩০	
৩। সমতুল ভূমির শালবন	বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর রংপুর জেলা	শাল, কড়ই, হলদী, ভাদী, বহেড়া, আমলকী প্রভৃতি	০.৩০	৫১.৮৯
৪। গ্রামীণ বন	সমগ্র বাংলাদেশ	বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ফলের গাছ ও বাঁশ প্রভৃতি	০.৬৭	১,৯৩১.৮০
মোট			৪.৩৮	৩,৬৩৮.৫০

উৎস : *Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood ; a research mimio. BARC, Dhaka, 1090.*